ধর্ম্ম ও জাতীয়তা

শ্রীঅরবিন্দ

১৩৫৩

আর্য্যপাবলিশিং হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
আর্য্য পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ... ... ভাদ্র ১৩২৭
২য় ও ৩য় সংস্করণ ... ... আষাঢ় ১৩২৯, আশ্বিন ১৩৩৮
চতুর্থ সংস্করণ ... ... জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস
পণ্ডিচেরী

বিষয় সূচী

১।	আমাদের ধর্ম্ম	৭
২।	গীতার ধর্ম্ম	১২
৩।	সন্ন্যাস ও ত্যাগ	১৭
৪।	মায়া	২৩
৫।	অহঙ্কার	৩০
৬।	নিবৃত্তি	৩৩
৭।	উপনিষদ	৩৭
৮।	পুরাণ	৪১
৯।	প্রাকাম্য	৪৪
১০।	বিশ্বরূপদর্শন	৫০
১১।	স্তবস্তোত্র	৫৬
১২।	নবজন্ম	৬৩
১৩।	জাতীয় উত্থান	৬৮
১৪।	অতীতের সমস্যা	৭৫
১৫।	স্বাধীনতার অর্থ	৮৬
১৬।	দেশ ও জাতীয়তা	৮৯
১৭।	আমাদের আশা	৯৩
১৮।	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	৯৮
১৯।	ভ্রাতৃত্ব	১০৫
২০।	ভারতীয় চিত্রবিদ্যা	১১১

১৩১৬ সালে প্রকাশিত
সাপ্তাহিক পত্র ধর্ম্মে
প্রবন্ধগুলি প্রথম বাহির হয়

ধর্ম্ম
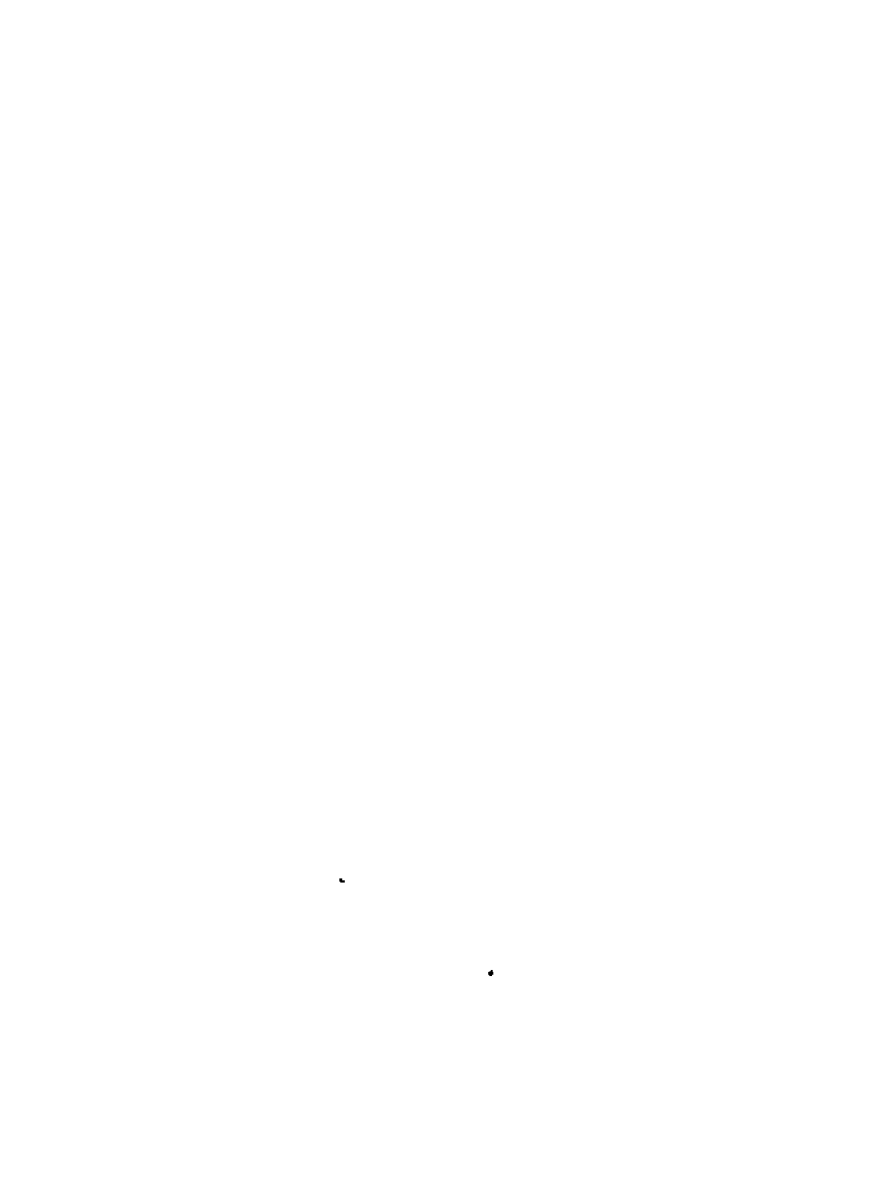
আমাদের ধর্ম্ম

আমাদের ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম ত্রিবিধ, ত্রিমার্গগামী, ত্রিকর্ম্মরত। আমাদের ধর্ম্ম ত্রিবিধ। ভগবান অন্তরাত্মায়, মানসিক জগতে, স্থূল জগতে—এই ত্রিধামে প্রকৃতিসৃষ্ট মহাশক্তি-চালিত বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এই ত্রিধামে তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার চেষ্টা সনাতন ধর্ম্মের ত্রিবিধত্ব। আমাদের ধর্ম্ম ত্রিমার্গগামী। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম—এই তিনটি স্বতন্ত্র বা মিলিত উপায়ে সেই যুক্তাবস্থা মানুষের সাধ্য। এই তিন উপায়ে আত্মশুদ্ধি করিয়া ভগবানের সহিত যোগলিপ্সা সনাতন ধর্ম্মের ত্রিমার্গগামী গতি। আমাদের ধর্ম্ম ত্রিকর্ম্মরত। মানুষের প্রধান বৃত্তি সকলের মধ্যে তিনটি ঊর্দ্ধগামিনী, ব্রহ্মপ্রাপ্তি-বলদায়িনী—সত্য, প্রেম ও শক্তি। এই তিন বৃত্তির বিকাশে মানবজাতির ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়া আসিতেছে। সত্য, প্রেম ও শক্তি দ্বারা ত্রিমার্গে অগ্রসর হওয়া সনাতন ধর্ম্মের ত্রিকর্ম্ম।

সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে অনেক গৌণ ধর্ম্ম নিহিত ; সনাতনকে অবলম্বন করিয়া পরিবর্ত্তনশীল মহান্, ক্ষুদ্র নানাবিধ ধর্ম্ম স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বভাবসৃষ্ট। সনাতন ধর্ম্ম জগতের সনাতন স্বভাব আশ্রিত, এই নানাবিধ ধর্ম্ম নানাবিধ আধারগত স্বভাবের ফল। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, জাতি ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রিত ধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম ইত্যাদি নানা ধর্ম্ম আছে। অনিত্য বলিয়া সেই-গুলি উপেক্ষণীয় বা বর্জ্জনীয় নয়, বরং এই অনিত্য পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম দ্বারাই সনাতন ধর্ম্ম বিকশিত ও অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, বর্ণাশ্রিত ধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে সনাতন ধর্ম্মের পুষ্টি না হইয়া অধর্ম্মই বর্দ্ধিত হয় এবং গীতায় যাহাকে সঙ্কর বলে, অর্থাৎ সনাতন প্রণালী ভঙ্গ ও ক্রমোন্নতির বিপরীত গতি বসুন্ধরাকে পাপে ও অত্যাচারে দগ্ধ করে। যখন সেই পাপের ও অত্যাচারের অতিরিক্ত মাত্রায় মানুষের উন্নতির বিরোধিনী ধর্ম্মদলনী আসুরিক শক্তিসকল স্ফীত ও বলযুক্ত হইয়া স্বার্থ, ক্রূরতা ও অহঙ্কারে দশদিক আচ্ছন্ন করে, অনীশ্বর জগতে ঈশ্বর সাজিতে আরম্ভ করে, তখন ভারার্ত্ত পৃথিবীর দুঃখলাঘব করিবার মানসে ভগবানের অবতার কিম্বা বিভূতি মানবদেহে প্রকাশ হইয়া আবার ধর্ম্মপথ নিষ্কণ্টক করেন।

সনাতন ধর্ম্মের যথার্থ পালনের জন্য ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, জাতি ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রিত ধর্ম্ম ও যুগধর্ম্মের আচরণ সর্ব্বদা রক্ষণীয় ; কিন্তু এই নানাবিধ ধর্ম্মের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মহান দুই রূপ আছে। মহান ধর্ম্মের সঙ্গে ক্ষুদ্র ধর্ম্ম মিলাইয়া ও সংশোধন করিয়া

অনুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম জাতিধর্ম্মের অঙ্কাশ্রিত করিয়া আচরণ না করিলে জাতি ভাঙ্গিয়া যায় এবং জাতিধর্ম্ম লুপ্ত হইলে ব্যক্তিগত ধর্ম্মের ক্ষেত্র ও সুযোগ নষ্ট হয়। ইহাও ধর্ম্মসঙ্কর—যে ধর্ম্মসঙ্করের প্রভাবে জাতি ও সঙ্করকারীগণ উভয়ে অতল নরকে নিমগ্ন হয়। জাতিকে আগে রক্ষা করিতে হয়, তবেই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি নিরাপদ করা যায়। বর্ণাশ্রিত ধর্ম্মকেও যুগধর্ম্মের ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতে না পারিলে মহান্ যুগধর্ম্মের প্রতিকূল গতিতে বর্ণাশ্রিত ধর্ম্ম চূর্ণ ও বিনষ্ট হইয়া সমাজও চূর্ণ ও বিনষ্ট হয়। ক্ষুদ্র সর্ব্বদা মহতের অংশ বা সহায় স্বরূপ, এই সম্বন্ধের বিপরীত অবস্থায় ধর্ম্মসঙ্করসম্ভূত মহান্ অনিষ্ট ঘটে। ক্ষুদ্র ধর্ম্মে ও মহান্ ধর্ম্মে বিরোধ হইলে ক্ষুদ্র ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মহান্ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান মঙ্গলপ্রদ।

আমাদের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্ম্ম প্রচার ও সনাতন-ধর্ম্মাশ্রিত জাতিধর্ম্ম ও যুগধর্ম্ম অনুষ্ঠান। আমরা ভারতবাসী, আর্য্যজাতির বংশধর, আর্য্যশিক্ষা ও আর্য্যনীতির অধিকারী। এই আর্য্যভাবই আমাদের কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম। জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্ম আর্য্যশিক্ষার মূল; জ্ঞান, উদারতা, প্রেম, সাহস, শক্তি, বিনয় আর্য্যচরিত্রের লক্ষণ। মানবজাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে উন্নত উদার চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ দেওয়া, দুর্ব্বলকে রক্ষা করা, প্রবল অত্যাচারীকে শাসন করা আর্য্যজাতির জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাহার ধর্ম্মের চরিতার্থতা। আমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট,

লক্ষ্যভ্রষ্ট, ধর্ম্মসঙ্কর ও ভ্রান্তিসঙ্কুল তামসিক মোহে পড়িয়া আর্য্য-শিক্ষাও নীতি-হারা। আমরা আর্য্যজাতি হইয়া শূদ্রত্ব ও শূদ্রধর্ম্মরূপ দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়া জগতে হেয়, প্রবল-পদদলিত ও দুঃখ-পরম্পরা প্রপীড়িত হইয়াছি। অতএব যদি বাঁচিতে হয়, যদি অনন্ত নরক হইতে মুক্ত হইবার লেশমাত্র অভিলাষ থাকে, জাতির রক্ষা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। জাতিরক্ষার উপায় আর্য্যচরিত্রের পুনর্গঠন। যাহাতে জননী জন্মভূমির ভাবী সন্তান জ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ, মানবপ্রেমপূর্ণ, ভ্রাতৃভাবের ভাবুক, সাহসী, শক্তিমান, বিনীত হয়, সমস্ত জাতিকে, বিশেষতঃ যুবক-সম্প্রদায়কে সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষা, উচ্চ আদর্শ ও আর্য্যভাব-উদ্দীপক কর্ম্ম-প্রণালী দেওয়া আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য। এই কার্য্যে কৃতার্থ না হওয়া পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্মপ্রচার ঊষর ক্ষেত্রে বীজবপন মাত্র।

জাতিধর্ম্ম অনুষ্ঠানে যুগধর্ম্মসেবা সহজসাধ্য হইবে। এই যুগ শক্তি ও প্রেমের যুগ। যখন কলির আরম্ভ হয়, জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির অধীন ও সাহায্যকারী হইয়া স্ব স্ব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সত্য ও শক্তি প্রেমকে আশ্রয় করিয়া মানবজাতির মধ্যে প্রেম-বিকাশ করিতে সচেষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের মৈত্রী ও দয়া, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রেমশিক্ষা, মুসলমান ধর্ম্মের সাম্য ও ভ্রাতৃভাব, পৌরাণিক ধর্ম্মের ভক্তি ও প্রেমভাব এই চেষ্টার ফলস্বরূপ। কলিযুগে সনাতন ধর্ম্ম মৈত্রী, কর্ম্ম, ভক্তি, প্রেম, সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের সাহায্য লইয়া মানব-কল্যাণ সাধিত করে। জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্ম গঠিত আর্য্যধর্ম্মে এই শক্তি সকল প্রবিষ্ট ও বিকশিত হইয়া বিস্তার ও

স্বপ্রবৃত্তিপূরণের পথ খুঁজিতেছে। শক্তিস্ফূরণের লক্ষণ কঠিন তপস্যা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মহৎ কর্ম্ম। যখন এই জাতি তপস্বী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, মহৎ কর্ম্মপ্রয়াসী হইবে, তখন বুঝিতে হইবে, জগতের উন্নতির আরব্ধ হইয়াছে, ধর্ম্মবিরোধিনী আসুরিক শক্তির সঙ্কোচ ও দেবশক্তির পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। অতএব এইরূপ শিক্ষাও বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজনীয়।

যুগধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম সাধিত হইলে জগৎময় সনাতন ধর্ম্ম অবাধে প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব্বকাল হইতে যাহা বিধাতা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, যে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ উক্তি শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহাও কার্য্যে অনুভূত হইবে। সমস্ত জগৎ আর্য্যদেশসম্ভূত ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট জ্ঞান-ধর্ম্ম-শিক্ষাপ্রার্থী হইয়া ভারতভূমিকে তীর্থ মানিয়া অবনত মস্তকে তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিবে। সেইদিন আনয়নের জন্য ভারতবাসীর জাগরণ, আর্য্যভাবের নবোত্থান।

গীতার ধর্ম্ম

যাঁহারা গীতা মনোযোগপূর্ব্বক পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মনে হয়ত এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বারবার যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ও যুক্তাবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন; কই সাধারণ লোকে যাহাকে যোগ বলে, তাহার সঙ্গে তাহার মিল ত হয় না; শ্রীকৃষ্ণ স্থানে স্থানে সন্ন্যাসের প্রশংসা করিয়াছেন, অনির্দ্দেশ্য পরব্রহ্মের উপাসনায় পরম গতিও নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অতি সংক্ষেপে সাঙ্গ করিয়া গীতার শ্রেষ্ঠাংশে ত্যাগের মহত্ত্ব ও বাসুদেবের উপর শ্রদ্ধায় ও আত্মসমর্পণে পরমাবস্থাপ্রাপ্তি বিবিধ উপায়ে অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজ-যোগের কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে, কিন্তু গীতাকে রাজযোগাখ্যাপকগ্রন্থ বলা যায় না। সমতা, অনাসক্তি, কর্ম্মফলত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, নিষ্কাম কর্ম্ম, গুণাতীত্য ও স্বধর্ম্মসেবাই গীতার মূলতত্ত্ব। এই শিক্ষাকেই ভগবান পরম জ্ঞান ও গূঢ়তম রহস্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস গীতাই জগতের ভাবীধর্ম্মের সর্ব্বজনসম্মত শাস্ত্র হইবে। কিন্তু গীতার প্রকৃত অর্থ সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। বড় বড় পণ্ডিত

ও শ্রেষ্ঠ মেধাবী তীক্ষ্ণবুদ্ধি লেখকও ইহার গূঢ়ার্থ গ্রহণে অক্ষম। একদিকে মোক্ষপরায়ণ ব্যাখ্যাকর্ত্তা গীতার মধ্যে অদ্বৈতবাদ ও সন্ন্যাসধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়াছেন, অপরদিকে ইংরাজ-দর্শন-সিদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র গীতায় কেবলমাত্র বীরভাবে কর্ত্তব্যপালনের উপদেশ পাইয়া সেই অর্থই তরুণমণ্ডলীর মনে ঢুকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ধর্ম্ম অল্পসংখ্যক লোক আচরণ করিতে পারে। সর্ব্বজনসম্মত ধর্ম্মে এমন আদর্শ ও তত্ত্বশিক্ষা থাকা অবশ্যক যে সর্ব্বসাধারণে তাহা স্ব স্ব জীবনে ও কর্ম্মক্ষেত্রে উপলব্ধি করিতে পারে, অথচ সেই আদর্শ সম্পূর্ণ আচরণ করায় অল্পজনসাধ্য পরম গতি প্রাপ্ত হইবে। বীরভাবে কর্ত্তব্যপালন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বটে, তবে কর্ত্তব্য কি, এই জটিলসমস্যা লইয়া ধর্ম্ম ও নীতির যত বিভ্রাট। ভগবান বলিয়াছেন, গহনা কর্ম্মণো গতিঃ, কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম, কি বিকর্ম্ম তাহা নির্ণয় করিতে জ্ঞানীও বিব্রত হইয়া পড়েন, আমি কিন্তু তোমাকে এমন জ্ঞান দিব যে তোমার গন্তব্যপথ নির্দ্ধারণে বেগ পাইতে হইবে না, কর্ম্মজীবনের লক্ষ্য ও সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয় নিয়ম এককথায় বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। এই জ্ঞানটা কি, এই লাখ কথার এক কথা কোথায় পাইব? আমাদের বিশ্বাস গীতার শেষ অধ্যায়ে ভগবান যেখানে তাঁহার সর্ব্বগুহ্যতম পরম বক্তব্য অর্জ্জুনের নিকট বলিতে প্রতিশ্রুত হন, সেইখানেই এই দুর্ল্লভ অমূল্য বস্তু অন্বেষণ করিলে পাওয়া যায়। সেই সর্ব্বগুহ্যতম পরম কথা কি?

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এই দুইটি শ্লোকের অর্থ এক কথায়ই ব্যক্ত হয়, আত্মসমর্পণ। যিনি যত পরিমাণে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহার শরীরে তত পরিমাণে ভগবদ্দত্ত শক্তি আসিয়া পরম মঙ্গলময়ের প্রসাদে পাপমুক্ত ও দেবভাবপ্রাপ্ত করে। সেই আত্মসমর্পণের বর্ণনা প্রথম শ্লোকার্দ্ধে করা হইয়াছে। তন্মনা তদ্ভক্ত তদ্‌যাজী হইতে হয়। তন্মনা অর্থাৎ সর্ব্বভূতে তাঁহাকে দর্শন করা, সর্ব্বকালে তাঁহাকে স্মরণ করা, সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্ব-ঘটনায় তাঁহার শক্তি জ্ঞান ও প্রেমের খেলা বুঝিয়া পরমানন্দে থাকা। তদ্ভক্ত অর্থাৎ তাঁহার উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও প্রীতি স্থাপন করিয়া তাঁহার সহিত যুক্ত থাকা। তদযাজী অর্থাৎ ক্ষুদ্র মহৎ সর্ব্বকর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে অর্পণ করা এবং স্বার্থ ও কর্ম্মফল আসক্তি ত্যাগ করিয়া তদর্থে কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ মানুষের পক্ষে কঠিন, কিন্তু অল্পমাত্র চেষ্টা করিলে স্বয়ং ভগবান অভয়দানে গুরু, রক্ষক ও সুহৃদ্ হইয়া যোগপথে অগ্রসর করাইয়া দেন। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। তিনি বলিয়াছেন এই ধর্ম্ম আচরণ করা সহজ ও সুখ-প্রদ। বাস্তবিকই তাহাই, অথচ সম্পূর্ণ আচরণের ফল অনির্ব্বচ-নীয় আনন্দ, শুদ্ধি ও শক্তিলাভ। মামেবৈষ্যসি অর্থাৎ আমাকে

প্রাপ্ত হইবে, আমার সহিত বাস করিবে, আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। এই কথায় সাদৃশ্য, সালোক্য ও সাযুজ্য ফলপ্রাপ্তি ব্যক্ত হইয়াছে। যিনি গুণাতীত তিনিই ভগবানের সাদৃশ্যপ্রাপ্ত। তাঁহার কোনও আসক্তি নাই, অথচ তিনি কর্ম্ম করেন, পাপমুক্ত হইয়া মহাশক্তির আধার হন ও সেই শক্তির সর্ব্বকার্য্যে আনন্দিত হন। সালোক্যও কেবল দেহপতনান্তর ব্রহ্মলোকগতি নয়, এই শরীরেও সালোক্য হয়। দেহযুক্ত জীব যখন তাঁহার অন্তরে পরমেশ্বরের সহিত ক্রীড়া করেন, মন তাঁহার দত্ত জ্ঞানে পুলকিত হয়, হৃদয় তাঁহার প্রেমস্পর্শে আনন্দপ্লুত হয়, বুদ্ধি মুহুর্মুহুঃ তাঁহার বাণী শ্রবণ করে ও প্রত্যেক চিন্তায় তাঁহারই প্রেরণা জ্ঞাত হয়, ইহাই মানবশরীরে ভগবানের সহিত সালোক্য। সাযুজ্যও এই শরীরে ঘটে। গীতায় তাঁহার মধ্যে নিবাস করার কথা পাওয়া যায়। যখন সর্ব্বজীবে তিনি, এই উপলব্ধি স্থায়ীভাবে থাকে, ইন্দ্রিয়সকল তাঁহাকেই দর্শন করে, শ্রবণ করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, স্পর্শ করে, জীব সর্ব্বদা তাঁহার মধ্যে অংশভাবে থাকিতে অভ্যস্ত হয়, তখন এই শরীরেও সাযুজ্য হয়। এই পরমগতি সম্পূর্ণ অনুশীলনের ফল। কিন্তু এই ধর্ম্মের অল্প আচরণেও মহতী শক্তি, বিমল আনন্দ, পূর্ণ সুখ ও শুদ্ধতা লাভ হয়। এই ধর্ম্ম বিশিষ্ট-গুণ-সম্পন্ন লোকের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ভগবান বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পুরুষ, স্ত্রী, পাপযোনি-প্রাপ্ত-জীবসকল পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই ধর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে। ঘোর পাপীও তাঁহার শরণ লইয়া অল্পদিনের মধ্যে

বিশুদ্ধ হয়। অতএব এইধর্ম্ম সকলের আচরণীয়। জগন্নাথের মন্দিরে জাতিবিচার নাই। অথচ ইহার পরমগতি কোনও ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট পরমাবস্থার ন্যূন নয়।

সন্ন্যাস ও ত্যাগ

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, গীতোক্ত ধর্ম্ম সকলের আচরণীয়, গীতোক্ত যোগে সকলের অধিকার আছে অথচ সেই ধর্ম্মের পরমাবস্থা কোনও ধর্ম্মোক্ত পরমাবস্থাপেক্ষা ন্যূন নহে। গীতোক্ত ধর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্মীর ধর্ম্ম। আমাদের দেশে আর্য্যধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহিত একটি সন্ন্যাসমুখী স্রোত দেশময় ব্যাপ্ত হইতেছে। রাজযোগ-প্রয়াসী ব্যক্তির মন সহজে গৃহকর্ম্মে বা গৃহবাসে সন্তুষ্ট থাকিতে চায় না। তাঁহার যোগাভ্যাসে ধ্যান-ধারণার বহুলায়াস-পূর্ণ চেষ্টা আবশ্যক। অল্প মনঃক্ষোভে অথবা বাহ্যস্পর্শে ধ্যান-ধারণার স্থিরতা বিচলিত হয় বা সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। গৃহে এইরূপ বাধা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। অতএব যাঁহারা পূর্ব্বজন্মপ্রাপ্ত যোগলিপ্সা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে তরুণ বয়সে সন্ন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। যখন এইরূপ-জন্মপ্রাপ্ত যোগলিপ্সুদিগের সংখ্যা অধিক হইয়া দেশময় সেই শক্তি-সংক্রামণে যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসমুখী স্রোত প্রবল হয়, তখন দেশের কল্যাণ-পথের দ্বারও উন্মুক্ত হয়, সেই কল্যাণ-সংশ্লিষ্ট বিপদের আশঙ্কাও হয়। বলা হইয়াছে,

সন্ন্যাসধর্ম্ম উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, কিন্তু সেই ধর্ম্ম গ্রহণে অল্প লোকই অধিকারী। যাঁহারা বিনা অধিকারে সেই পথে প্রবেশ করেন, তাঁহারা শেষে অল্পদূর অগ্রসর হইয়া অর্দ্ধপথে তামসিক অপ্রবৃত্তি-জনক আনন্দের অধীন হইয়া নিবৃত্ত হন। এই অবস্থায় ইহজীবন সুখে কাটে বটে, কিন্তু জগতের হিতও সাধিত হয় না, যোগের উর্দ্ধতম সোপানে আরোহণও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। আমাদের যেরূপ কাল ও অবস্থা আগত, তাহাতে রজঃ ও সত্ত্ব অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও জ্ঞান জাগাইয়া তমোবর্জ্জনপূর্ব্বক দেশের সেবায় ও জগতের সেবায় জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি ও নৈতিক বল পুনরুজ্জীবিত করা এখন প্রধান কর্ত্তব্য। এই জীর্ণশীর্ণ তমঃ-পীড়িত স্বার্থসীমা-বদ্ধ জাতির ঔরসে জ্ঞানী, শক্তিমান ও উদার আর্য্যজাতির পুনঃ-সৃষ্টি করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থই বঙ্গদেশে এত শক্তিবিশিষ্ট যোগবলপ্রাপ্ত জীবের জন্ম হইতেছে। ইহারা যদি সন্ন্যাসের মোহিনী শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ ও ঈশ্বর-দত্ত কর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করেন, তবে ধর্ম্মনাশে জাতির ধ্বংস হইবে। তরুণসম্প্রদায় যেন মনে করেন যে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট; এই আশ্রমের পরবর্ত্তী অবস্থা গৃহস্থাশ্রম বিহিত আছে। যখন কুলরক্ষা ও ভাবী আর্য্যজাতি গঠন দ্বারা পূর্ব্বপুরুষদের নিকট ঋণমুক্ত হইতে পারিব, যখন সৎকর্ম্ম ধনসঞ্চয় দ্বারা সমাজের ঋণ এবং জ্ঞান দয়া প্রেম ও শক্তি বিতরণে জগতের ঋণ শোধ হইবে, যখন ভারতজননীর হিতার্থ উদার ও মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনে জগন্মাতা সন্তুষ্ট হইবেন, তখন

বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আচরণ করা দোষাবহ হইবে না। অন্যথা ধর্ম্মসঙ্কর ও অধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বজন্মে ঋণমুক্ত বালসন্ন্যাসীদের কথা বলিতেছি না ; কিন্তু অনধিকারীর সন্ন্যাসগ্রহণ নিন্দনীয়। অযথা বৈরাগ্যবাহুল্যে ও ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মত্যাগপ্রবণতায় মহান ও উদার বৌদ্ধধর্ম্ম দেশের অনেক হিত সম্পাদন করিয়াও অনিষ্ট করিয়াছে এবং শেষে ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। নবযুগের নবীন ধর্ম্মের মধ্যে যেন এই দোষ প্রবিষ্ট না হয়।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ অর্জ্জুনকে সন্ন্যাস আচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন কেন? তিনি সন্ন্যাসধর্ম্মের গুণ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বৈরাগ্য ও কৃপাপরবশ পার্থ বারবার জিজ্ঞাসা করাতেও শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মপথের আদেশ প্রত্যাহার করেন নাই। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কর্ম্ম হইতে কামনারহিত যোগযুক্ত বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হয়, তবে তুমি কেন গুরুজনহত্যারূপ অতি ভীষণ কর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ ; অনেকে অর্জ্জুনের প্রশ্ন পুনরুত্থাপন করিয়াছেন, এক-একজন শ্রীকৃষ্ণকে নিকৃষ্ট ধর্ম্মোপদেষ্টা ও কুপথপ্রবর্ত্তক বলিতেও কুন্ঠিত হন নাই। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়াছেন যে, সন্ন্যাস হইতে ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, স্বেচ্ছাচার হইতে ভগবানকে স্মরণ করিয়া নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্ম-সেবাই উৎকৃষ্ট। ত্যাগের অর্থ কামনাত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, সেই ত্যাগ শিক্ষার জন্য পর্ব্বতে বা নির্জ্জনস্থানে আশ্রয় লইতে হয় না, কর্ম্মক্ষেত্রেই কর্ম্ম দ্বারা সেই শিক্ষা হয়, কর্ম্মই যোগপথে আরোহণের উপায়। এই বিচিত্র লীলাময় জগৎ জীবের

আনন্দ উৎপাদনের জন্য সৃষ্ট। ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে যে, এই আনন্দময় ক্রীড়া সাঙ্গ হউক। তিনি জীবকে তাঁহার সখা ও খেলার সাথী করিয়া জগতে আনন্দের স্রোত চালাইতে চান। আমরা যে অজ্ঞান অন্ধকারে আছি, ক্রীড়ার সুবিধার জন্য তিনি দূরে রহিয়াছেন বলিয়াই সে অন্ধকার ঘিরিয়া থাকে। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট এমন অনেক উপায় আছে যাহা অবলম্বন করিলে অন্ধকার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তাঁহার সান্নিধ্যপ্রাপ্তি হয়। যাঁহারা তাঁহার ক্রীড়ায় বিরক্ত বা বিশ্রামপ্রার্থী হন, তিনি তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহারই জন্য সেই উপায় অবলম্বন করেন, ভগবান তাঁহাদিগকেই ইহলোকে বা পরলোকে খেলার উপযুক্ত সাথী করেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা ও ক্রীড়ার সহচর বলিয়া গীতার গূঢ়তম শিক্ষা লাভ করিলেন। সেই গূঢ়তম শিক্ষা কি, তাহা ইতি পূর্ব্বে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন, কর্ম্মসন্ন্যাস জগতের পক্ষে অনিষ্টকর এবং ত্যাগহীন সন্ন্যাস বিড়ম্বনা মাত্র। সন্ন্যাসে যে ফললাভ হয়, ত্যাগেও সেই ফললাভ হয়, অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে মুক্তি, সমতা, শক্তিলাভ, আনন্দলাভ, শ্রীকৃষ্ণলাভ। সর্ব্বজনপূজিত ব্যক্তি যাহা করেন, লোকে তাহাই আদর্শ করিয়া আচরণ করে, অতএব তুমি যদি কর্ম্মসন্ন্যাস কর, সকলে সেই পথের পথিক হইয়া ধর্ম্মসঙ্কর ও অধর্ম্মপ্রাধান্য সৃষ্টি করিবে। তুমি কর্ম্মফলস্পৃহা ত্যাগ করিয়া মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম আচরণ কর, আদর্শস্বরূপ হইয়া সকলকে নিজ নিজ কর্ম্মপথে অগ্রসর

হইবার প্রেরণা দাও, তাহা হইলেই আমার সাধর্ম্ম্যপ্রাপ্ত ও প্রিয়তম সুহৃদ হইবে। তাহার পরে তিনি বুঝাইয়াছেন যে, কর্ম্মদ্বারা শ্রেয়ঃ-পথে আরূঢ় হইয়া সেই পথের শেষ অবস্থায় **শম** অর্থাৎ সর্ব্ব-আরম্ভ-ত্যাগই বিহিত। ইহাও কর্ম্মসন্ন্যাস নহে, তাহা অহঙ্কার-বর্জ্জন-পূর্ব্বক বহুলায়াসপূর্ণ রাজসিক চেষ্টা-ত্যাগে ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া, গুণাতীত হইয়া তাঁহার শক্তি-চালিত যন্ত্রের ন্যায় কর্ম্ম করা। সেই অবস্থায় জীবের এই স্থায়ী জ্ঞান হয় যে, আমি কর্ত্তা নহি, আমি দ্রষ্টা, আমি ভগবানের অংশ, আমার স্বভাবরচিত এই দেহরূপ কর্ম্মময় আধারে ভগবানের শক্তিই লীলার কার্য্য করে। জীব সাক্ষী ও ভোক্তা, প্রকৃতি কর্ত্তা, পরমেশ্বর অনুমন্তা। এই জ্ঞানপ্রাপ্ত পুরুষ শক্তির কোনও কার্য্যারম্ভে কামনারূপ সাহায্য বা বাধা দিতে ইচ্ছুক হন না। শক্তির অধীন হইয়া দেহ-মন-বুদ্ধি ঈশ্বরাদিষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকাণ্ডও যদি ভগবানের অনুমত হয় এবং স্বধর্ম্মপথে যদি তাহাই ঘটে, তাহাতেও অলিপ্তবুদ্ধি কামনারহিত জ্ঞানপ্রাপ্ত জীবের পাপস্পর্শ হয় না। কিন্তু ইহা অতি অল্পলোকের লভ্য জ্ঞান ও আদর্শ, ইহা সাধারণ ধর্ম্ম হইতে পারে না। তবে এই পথের সাধারণ পথিকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি? তাহারও এই জ্ঞান কতক পরিমাণে প্রাপ্য যে, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র। সেই জ্ঞানের বলে ভগবানকে স্মরণ করিয়া স্বধর্ম্মসেবাই তাহার পক্ষে আদিষ্ট।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

স্বধর্ম্ম স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম। কালের গতিতে স্বভাবের অভিব্যক্তি ও পরিণতি হয়। কালের গতিতে মানুষের যে সাধারণ স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম যুগধর্ম্ম। জাতির কর্ম্মগতিতে যে জাতীয় স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম জাতির ধর্ম্ম। ব্যক্তির কর্ম্মগতিতে যে স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম ব্যক্তির ধর্ম্ম। এই নানা ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্মের সাধারণ আদর্শ দ্বারা পরস্পর-সংযুক্ত ও শৃঙ্খলিত হয়। সাধারণ ধাম্মিকের পক্ষে এই ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম। ব্রহ্মচারী অবস্থায় এই ধর্ম্ম সেবার জন্য জ্ঞান ও শক্তি সঞ্চিত হয়, গৃহস্থাশ্রমে এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, এই ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে বানপ্রস্থে বা সন্ন্যাসে অধিকার-প্রাপ্তি হয়। ইহাই ধর্ম্মের সনাতন গতি।

মায়া

আমাদের পুরাতন দার্শনিকগণ যখন জগতের মূলতত্ত্বগুলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহারা এই প্রপঞ্চের মূলে একটি অনশ্বর ব্যাপক বস্তুর অস্তিত্ব অবগত হইলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহুকালের অনুসন্ধানে বাহ্যজগতেও এই অনশ্বর সর্ব্বব্যাপী একত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। তাঁহারা আকাশকেই ভৌতিক প্রপঞ্চের মূলতত্ত্ব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভারতের পুরাতন দার্শনিকগণও বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, আকাশই ভৌতিক প্রপঞ্চের মূল, তাহা হইতে আর সকল ভৌতিক অবস্থা প্রাকৃতিক পরিণাম দ্বারা উদ্ভূত হয়। তবে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা যোগবলে সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, স্থূল ভৌতিক প্রপঞ্চের পশ্চাতে একটি সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ আছে, এই প্রপঞ্চের মূল ভৌতিক তত্ত্ব সূক্ষ্ম আকাশ। এই আকাশও শেষ বস্তু নহে, তাঁহারা শেষ বস্তুকে প্রধান বলিতেন। প্রকৃতি বা জগন্ময়ী ক্রিয়াশক্তি তাঁহার সর্ব্বব্যাপী স্পন্দনে এই প্রধান সৃষ্টি করিয়া তাহা

হইতে কোটি কোটি অণু উৎপাদন করেন এবং এই অণুদ্বারা সূক্ষ্মভূত গঠিত হয়। প্রকৃতি বা ক্রিয়াশক্তি আপনার জন্য কিছুই করেন না; যাঁহার শক্তি, তাঁহারই তুষ্টিসম্পাদনার্থ এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি ও নানাবিধ গতি। আত্মা বা পুরুষ এই প্রকৃতির ক্রীড়ায় অধ্যক্ষ ও সাক্ষী। পুরুষ ও প্রকৃতি যাহার স্বরূপ ও ক্রিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্ম জগতের অনশ্বর অদ্বিতীয় মূল সত্য। মুখ্য মুখ্য উপনিষদে আর্য্য ঋষিগণের তত্ত্ব অনুসন্ধানে যে সত্যগুলির আবিষ্কার হইয়াছিল, তাহাদের কেন্দ্র স্বরূপ এই ব্রহ্মবাদ ও পুরুষপ্রকৃতিবাদ প্রতিষ্ঠিত আছে। তত্ত্ব-দর্শিগণ এই মূল সত্যগুলি লইয়া নানা তর্ক ও বাদ-বিবাদে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপ্রণালী সৃষ্টি করিলেন। যাহারা ব্রহ্মবাদী তাঁহারা বেদান্ত দর্শনের প্রবর্ত্তক; যাঁহারা প্রকৃতিবাদের পক্ষপাতী তাঁহারা সাঙ্খ্যদর্শন প্রচার করিলেন। তাহা ভিন্ন অনেকে পরমাণুকেই ভৌতিক প্রপঞ্চের মূলতত্ত্ব বলিয়া স্বতন্ত্র পথের পথিক হইলেন। এইরূপ নানা পন্থা আবিষ্কৃত হইবার পর, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই সকল চিন্তাপ্রণালীর সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া ব্যাসদেবের মুখে উপনিষদের সত্যগুলি পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিলেন। পুরাণকর্ত্তাগণও ব্যাসদেবের রচিত পুরাণকে আধার করিয়া সেই সত্যগুলির নানা ব্যাখ্যা—উপন্যাস ও রূপকচ্ছলে সাধারণ লোকের নিকট উপস্থিত করিলেন। ইহাতে বিদ্বান-মণ্ডলীর বাদবিবাদ বন্ধ হইল না, তাঁহারা স্ব স্ব মত প্রকাশপূর্ব্বক বিশদরূপে দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার সিদ্ধান্তসকল তর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন।

আমাদের ষড়দর্শনের আধুনিক স্বরূপ এই পরবর্ত্তী চিন্তার ফল। শেষে শঙ্করাচার্য্য দেশময় বেদান্ত প্রচারের অপূর্ব্ব ও স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ লোকের হৃদয়ে বেদান্তের আধিপত্য বদ্ধমূল করিলেন। তাহার পরে আর পাঁচটি দর্শন অল্পসংখ্যক বিদ্বানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিল বটে, কিন্তু তাহাদের আধিপত্য ও প্রভাব চিন্তা-জগৎ হইতে প্রায় তিরোহিত হইল। সর্ব্বজনসম্মত বেদান্ত দর্শনের মধ্যে মতভেদ উৎপন্ন হইয়া তিনটি মুখ্য শাখা ও অনেক গৌণ শাখা স্থাপিত হইল। জ্ঞানপ্রধান অদ্বৈতবাদ এবং ভক্তিপ্রধান বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের বিরোধ এখনও হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্যে বর্ত্তমান। জ্ঞানমার্গী, ভক্তের উদ্দাম প্রেম ও ভাব-প্রবণতাকে উন্মাদলক্ষণ বলিয়া উড়াইয়া দেন; ভক্ত, জ্ঞানমার্গীর তত্ত্বজ্ঞানস্পৃহাকে শুষ্ক তর্ক বলিয়া উপেক্ষা করেন। উভয় মতই ভ্রান্ত ও সঙ্কীর্ণ। ভক্তিশূন্য তত্ত্বজ্ঞানে অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়া মুক্তি-পথ অবরুদ্ধ থাকে, জ্ঞানশূন্য ভক্তি অন্ধবিশ্বাস ও ভ্রমসঙ্কুল তামসিকতা উৎপাদন করে। প্রকৃত উপনিষদ-দর্শিত ধর্ম্মপথে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য ও পরস্পর সহায়তা রক্ষিত হইয়াছে।

যদি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজনসম্মত আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত আর্য্যজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত করিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্র চিরকাল একপক্ষ-প্রকাশক ও অসম্পূর্ণ। সমস্ত জগৎ এক সঙ্কীর্ণ মতের অনুযায়ী তর্ক দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে গেলে সত্যের একদিক বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হয় বটে, কিন্তু
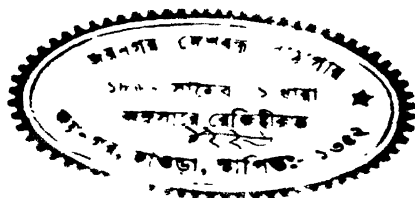
অপরদিকের অপলাপ হয়। অদ্বৈতবাদীদিগের মায়াবাদ এইরূপ অপলাপের দৃষ্টান্ত। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ইহাই মায়াবাদের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র যে জাতির চিন্তাপ্রণালীর মূলমন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই জাতির মধ্যে জ্ঞানলিপ্সা, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-প্রিয়তা বর্দ্ধিত হয়, রজঃশক্তি তিরোহিত হইয়া সত্ত্ব ও তমঃ প্রাবল্য-প্রাপ্ত হয় এবং একদিকে জ্ঞানপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী, সংসারে জাত-বিতৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত ও শান্তিপ্রার্থী বৈরাগীর সংখ্যাবৃদ্ধি, অপরদিকে তামসিক অজ্ঞ অপ্রবৃত্তি-মুগ্ধ অকর্ম্মণ্য সাধারণ প্রজার দুর্দ্দশাই সংঘটিত হয়। ভারতে মায়াবাদের প্রচারে তাহাই ঘটিয়াছে। জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তবে জ্ঞানতৃষ্ণা ভিন্ন সর্ব্বচেষ্টা নিরর্থক ও অনিষ্টকর বলিতে হয়। কিন্তু মানুষের জীবনে জ্ঞানতৃষ্ণা ভিন্ন অনেক প্রবল ও উপযোগী বৃত্তি ক্রীড়া করিতেছে, সেই সকলের উপেক্ষায় কোনও জাতি টিঁকিতে পারে না। এই অনর্থের ভয়ে শঙ্করাচার্য্য পারমার্থিক ও ব্যবহারিক বলিয়া জ্ঞানের দুইটি অঙ্গ দেখাইয়া অধিকারভেদে জ্ঞান ও কর্ম্মের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তিনি সেই যুগের ক্রিয়াসঙ্কুল কর্ম্মমার্গের তীব্র প্রতিবাদ করায় বিপরীত ফল ফলিয়াছে। শঙ্করের প্রভাবে সেই কর্ম্মমার্গ লুপ্ত-প্রায় হইল, বৈদিক ক্রিয়াসকল তিরোহিত হইল, কিন্তু সাধারণ লোকের মনে জগৎ মায়াসৃষ্ট, কর্ম্ম অজ্ঞানপ্রসূত ও মুক্তির বিরোধী, অদৃষ্টই সুখ-দুঃখের কারণ ইত্যাদি তমঃ-প্রবর্ত্তক-মত এমন দৃঢ়রূপে বসিয়া গেল যে, রজঃশক্তির পুনঃ-প্রকাশ অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর্য্যজাতির রক্ষার্থ ভগবান পুরাণ ও তন্ত্রপ্রচারে

মায়াবাদের প্রতিরোধ করিলেন। পুরাণে উপনিষদ-প্রসূত আর্য্য-ধর্ম্মের নানাদিক কতকটা রক্ষিত হইল, তন্ত্র শক্তি-উপাসনায় মুক্তি ও ভুক্তি রূপ দ্বিবিধ-ফল-প্রাপ্ত্যর্থ লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইলেন। প্রায়ই যাঁহারা জাতিরক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রতাপ-সিংহ, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, চাঁদরায় প্রভৃতি সকলেই শক্তি-উপাসক বা তান্ত্রিক-যোগীর শিষ্য ছিলেন। তমঃ-প্রসূত অনর্থের নিষেধ করিবার জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মসন্ন্যাসের বিরোধী উপদেশ দিয়াছেন।

মায়াবাদ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর পরম মায়াবী, তাঁহার মায়া দ্বারা দৃশ্য জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, ত্রৈগুণ্যময়ী মায়াই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। একই অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম জগতের মূল সত্য, সমস্ত প্রপঞ্চ তাঁহার অভিব্যক্তি মাত্র, স্বয়ং পরিণামশীল ও নশ্বর। যদি ব্রহ্ম একই সনাতন সত্য হয়, ভেদ ও বহুত্ব কোথা হইতে প্রসূত, কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কিরূপে উৎপন্ন, এই প্রশ্ন অনিবার্য্য। ব্রহ্ম যদি একমাত্র সত্য হয়, তবে ব্রহ্ম হইতেই ভেদ ও বহুত্ব প্রসূত, ব্রহ্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মের কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তি দ্বারা উৎপন্ন, ইহাই উপনিষদের উত্তর। সেই শক্তিকে কোথাও মায়াবীর মায়া, কোথাও পুরুষ-অধিষ্ঠিত প্রকৃতি, কোথাও ঈশ্বরের বিদ্যা-অবিদ্যাময়ী ইচ্ছাশক্তি বলা হইয়াছে। ইহাতে তার্কিকের মন সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই; কিরূপে এক বহু হয়, অভেদে ভেদ

উৎপন্ন হয়, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয় নাই। শেষে একটি সহজ উত্তর মনে উদয় হইল, এক বহু হয় না, সনাতন অভেদে ভেদ উৎপন্ন হইতে পারে না, বহু মিথ্যা, ভেদ অলীক, সনাতন অদ্বিতীয় আত্মার মধ্যে স্বপ্নের ন্যায় ভাসমান মায়া মাত্র, আত্মাই সত্য, আত্মাই সনাতন। ইহাতেও গোল, মায়া আবার কি, মায়া কোথা হইতে প্রসূত, কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কিরূপে উৎপন্ন হয়? শঙ্কর উত্তর করিলেন, মায়া কি তাহা বলা যায় না, মায়া অনির্ব্বচনীয়, মায়া প্রসূত হয় না, মায়া চিরকাল আছে অথচ নাই। গোল মিটিল না, সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না। এই তর্কে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মধ্যে আর-একটি সনাতন অনির্ব্বচনীয় বস্তু প্রতিষ্ঠিত হইল, একত্ব রক্ষিত হইল না।

শঙ্করের যুক্তি হইতে উপনিষদের যুক্তি উৎকৃষ্ট। ভগবানের প্রকৃতি জগতের মূল, সেই প্রকৃতি শক্তি, সচ্চিদানন্দের সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি। আত্মার পক্ষে ভগবান পরমাত্মা, জগতের পক্ষে পরমেশ্বর। 'পরমেশ্বরের ইচ্ছা শক্তিময়ী, সেই ইচ্ছা দ্বারাই এক হইতে বহু, অভেদে ভেদ উৎপন্ন হয়। পরমার্থের হিসাবে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, পরামায়াপ্রসূত, কারণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়। দেশকালের মধ্যেই প্রপঞ্চের অস্তিত্ব, ব্রহ্মের দেশকালাতীত অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মের মধ্যে প্রপঞ্চযুক্ত দেশকাল; ব্রহ্ম দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ নহে। জগৎ ব্রহ্ম হইতে প্রসূত, ব্রহ্মের

মধ্যে বর্ত্তমান, সনাতন অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মে আদ্যন্তবিশিষ্ট জগতের প্রতিষ্ঠা, তত্র ব্রহ্মের বিদ্যা-অবিদ্যাময়ী শক্তি দ্বারা সৃষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছে। যেমন মানুষের মধ্যে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিবার শক্তি ব্যতীত কল্পনা দ্বারা অলীক বস্তু উপলব্ধি করিবার শক্তি বিদ্যমান, তেমনি ব্রহ্মের মধ্যেও বিদ্যা ও অবিদ্যা, সত্য ও অনৃত আছে। তবে অনৃত দেশকালের সৃষ্টি। যেমন মানুষের কল্পনা দেশকালের গতিতে সত্যে পরিণত হয়, তেমনই যাহাকে আমরা অনৃত বলি তাহা সর্ব্বথা অনৃত নহে, সত্যের অননুভূত দিক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বং সত্যং; দেশকালাতীত অবস্থায় জগৎ মিথ্যা, কিন্তু আমরা দেশকালাতীত নহি, আমরা জগৎ মিথ্যা বলিবার অধিকারী নহি। দেশকালের মধ্যে জগৎ মিথ্যা নহে, জগৎ সত্য। যখন দেশকালাতীত হইয়া ব্রহ্মে বিলীন হইবার সময় আসিবে ও শক্তি উৎপন্ন হইবে, তখন আমরা জগৎ মিথ্যা বলিতে পারিব, অনধিকারী বলিলে মিথ্যাচার ও ধর্ম্মের বিপরীত গতি হয়। আমাদের পক্ষে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বলা অপেক্ষা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ ব্রহ্ম বলা উচিত। ইহাই উপনিষদের উপদেশ, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এই সত্যের উপর আর্য্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত।

অহঙ্কার

আমাদের ভাষায় অহঙ্কার শব্দটির এমন বিকৃত অর্থ হইয়া গিয়াছে যে, আর্য্যধর্ম্মের প্রধান প্রধান তত্ত্ব বুঝাইতে অনেক সময় গোল হইয়া পড়ে। গর্ব্ব রাজসিক অহঙ্কারের একটা বিশেষ পরিণাম মাত্র, অথচ সাধারণতঃ অহঙ্কার শব্দের এই অর্থই বোঝা যায়; অহঙ্কার-ত্যাগের কথা বলিতে গর্ব্ব পরিত্যাগ বা রাজসিক অহঙ্কার বর্জ্জনের কথা মনে উঠে। প্রকৃতপক্ষে অহংজ্ঞান মাত্রই অহঙ্কার। অহং-বুদ্ধি মানবের বিজ্ঞানময় আত্মার মধ্যে সৃষ্ট হয় এবং প্রকৃতির অন্তর্গত তিনটি গুণের ক্রীড়ায় তাহার তিন প্রকার বৃত্তি বিকশিত হয়, সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার। সাত্ত্বিক অহঙ্কার জ্ঞানপ্রধান ও সুখপ্রধান। আমার জ্ঞান হইতেছে, আমার আনন্দ হইতেছে, এই ভাব গুলি সাত্ত্বিক অহঙ্কারের ক্রিয়া। সাধকের অহং, ভক্তের অহং, জ্ঞানীর অহং, নিষ্কাম কর্ম্মীর অহং সত্ত্বপ্রধান, জ্ঞানপ্রধান, সুখপ্রধান। রাজসিক অহঙ্কার কর্ম্মপ্রধান। আমি কর্ম্ম করিতেছি, আমি জয় করিতেছি, পরাজিত হইতেছি, চেষ্টা করিতেছি, আমারই কার্য্য-

সিদ্ধি, আমারই অসিদ্ধি, আমি বলবান, আমি সিদ্ধ, আমি সুখী, আমি দুঃখী, এই সকল ভাব রজঃপ্রধান, কর্ম্মপ্রধান, প্রবৃত্তিজনক। তামসিক অহঙ্কার অজ্ঞতা ও নিশ্চেষ্টতায় পূর্ণ। আমি অধম, আমি নিরুপায়, আমি অলস, অক্ষম, হীন, আমার কোনও আশা নাই, প্রকৃতিতে লীন হইতেছি, লীন হওয়াই আমার গতি, এই সকল ভাব তমঃপ্রধান অপ্রবৃত্তি ও অপ্রকাশজনক। যাঁহারা তামসিক অহঙ্কারে ক্লিষ্ট, তাঁহাদের গর্ব্ব নাই, অথচ অহঙ্কার পূর্ণমাত্রায় আছে, কিন্তু সেই অহঙ্কার অধোগতি, নাশ ও শূন্য-ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু। যেমন গর্ব্বের অহঙ্কার আছে, তেমনই নম্রতার অহঙ্কারও আছে, যেমন বলের অহঙ্কার আছে, তেমনই দুর্ব্বলতার অহঙ্কারও আছে। যাঁহারা তামসিক ভাবে গর্ব্বহীন, তাঁহারা অধম, দুর্ব্বল, ভয়ে ও নিরাশায় পরপদানত। তামসিক নম্রতা, তামসিক ক্ষমা, তামসিক সহিষ্ণুতার কোনও মূল্য নাই ও কোনও সুফল নাই। যিনি সর্ব্বত্র নারায়ণকে দর্শন করিয়া সকলের নিকট নম্র, সহিষ্ণু ও ক্ষমাবান্ হন, তাঁহারই পুণ্য হয়। যিনি এই সকল অহঙ্কৃত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ত্রৈগুণ্যময়ী মায়াকে অতিক্রম করেন, তাঁহার গর্ব্বও নাই, নম্রতাও নাই, ভগবানের জগন্ময়ী শক্তি তাঁহার মনপ্রাণরূপ আধারে যে ভাব দেন, তিনি তাহা লইয়া সন্তুষ্ট, অনাসক্ত ও অটল শান্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তামসিক অহঙ্কার সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। রাজসিক অহঙ্কারকে জাগাইয়া সত্ত্ব-প্রসূত জ্ঞানের সাহায্যে তাহা নির্ম্মূল করা উন্নতির প্রথম সোপান। রাজসিক

অহঙ্কারের হস্ত হইতে মুক্তির উপায় জ্ঞান শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিকাশ। সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তি বলেন না যে, আমি সুখী ; তিনি বলেন, আমার প্রাণে সুখবিকাশ হইতেছে ; তিনি বলেন না যে, আমি জ্ঞানী ; তিনি বলেন, আমার মধ্যে জ্ঞানসঞ্চার হইতেছে। তিনি জানেন যে, সেই সুখ ও জ্ঞান তাঁহার নহে, জগন্মাতার। অথচ সর্ব্ব প্রকার অনুভবের সহিত যখন আনন্দসম্ভোগের জন্য লিপ্ততা থাকে তখন সেই জ্ঞানী বা ভক্তের ভাব অহঙ্কৃত। "আমার হইতেছে", যখন বলা হয় তখন অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ করা হইল না। গুণাতীত ব্যক্তিই সম্পূর্ণ অহঙ্কারজয়ী। তিনি জানেন, জীব সাক্ষী ও ভোক্তা, পুরুষোত্তম অনুমন্তা, প্রকৃতি কর্ত্তা, ইহার মধ্যে "আমি" নাই, সবই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের বিদ্যাবিদ্যামযী শক্তির লীলা। অহংজ্ঞান জীব-অধিষ্ঠিত প্রকৃতির মধ্যে একটি মায়াপ্রসূত ভাবমাত্র। এই অহংজ্ঞানরহিত ভাবের শেষ অবস্থা সচ্চিদানন্দে লয়। কিন্তু যিনি গুণাতীত হইয়াও পুরুষোত্তমের ইচ্ছায় লীলা মধ্যে অবস্থান করেন, তিনি পুরুষোত্তম ও জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আপনাকে প্রকৃতিবিশিষ্ট ভগবদংশ বুঝিয়া লীলার কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই ভাবকে অহঙ্কার বলা যায় না। এই ভাব পরমেশ্বরেরও আছে, তাঁহার মধ্যে অজ্ঞান বা লিপ্ততা নাই, কিন্তু আনন্দময় অবস্থা স্বস্থ না হইয়া জগন্মুখী হয়। যাঁহার এই ভাব, তিনিই জীবন্মুক্ত। লয়-রূপ মুক্তি দেহপাতে লাভ করা যায়। জীবন্মুক্তদশা দেহেই অনুভূত হয়।

নিবৃত্তি

আমাদের দেশে ধর্ম্মের কখনও সঙ্কীর্ণ ও জীবনের মহৎ কর্ম্মের বিরোধী ব্যাখ্যা মনীষিগণের মধ্যে গৃহীত হইত না। সমস্ত জীবনই ধর্ম্মক্ষেত্র, হিন্দুর জ্ঞান ও শিক্ষার মূলে এই মহৎ ও গভীর তত্ত্ব নিহিত ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার স্পর্শে কলুষিত হইয়া আমাদের জ্ঞান ও শিক্ষার বিকৃত ও অস্বাভাবিক অবস্থা হইয়াছে। আমরা প্রায়ই এই ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত হই যে, সন্ন্যাস, ভক্তি ও সাত্ত্বিক ভাব ভিন্ন আর কিছু ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না। পাশ্চাত্যগণ এই সঙ্কীর্ণ ধারণা লইয়া ধর্ম্মালোচনা করেন। হিন্দুরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুই ভাগে জীবনের যত কার্য্য বিভক্ত করিতেন; পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বহির্ভূত জীবনের অধিকাংশ ক্রিয়া ও বৃত্তির অনুশীলন, এই তিন ভাগ করা হইয়াছে। ভগবানের প্রশংসা, প্রার্থনা, সংকীর্ত্তন, গির্জ্জায় পাদ্রীর বক্তৃতা শ্রবণ ইত্যাদি কর্ম্মকে ধর্ম্ম বা religion বলে, morality বা সৎকার্য্য ধর্ম্মের অঙ্গ নহে, তাহা স্বতন্ত্র, তবে অনেকেই religion ও morality দুইটিই ধর্ম্মের গৌণ অঙ্গ বলিয়া স্বীকারও করেন। গির্জ্জায় না যাওয়া,

নাস্তিকবাদ বা সংশয়বাদ এবং religionএর নিন্দা বা তৎসম্বন্ধে ঔদাসীন্যকে অধর্ম্ম (irreligion) বলে, কুকার্য্য immorality বলে, পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে তাহাও অধর্ম্মের অঙ্গ। কিন্তু অধিকাংশ কর্ম্ম ও বৃত্তি ধর্ম্মাধর্ম্মের বহির্ভূত। religion ও life, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম স্বতন্ত্র। আমাদের মধ্যে অনেকে ধর্ম্ম শব্দের এইরূপ বিকৃত অর্থ করেন। সাধুসন্ন্যাসীর কথা, ভগবানের কথা, দেব-দেবীর কথা, সংসারবর্জ্জনের কথাকে তাঁহারা ধর্ম্ম নামে অভিহিত করেন ; কিন্তু আর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, তাঁহারা বলেন, ইহা সংসারের কথা, ধর্ম্মের কথা নহে। তাঁহাদের মনে পাশ্চাত্য religionএর ভাব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ধর্ম্ম শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র religionএর কথা মনে উদয় হয়, নিজের অজ্ঞাতসারেও সেই অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু আমাদের স্বদেশী কথায় এইরূপ বিদেশী ভাব প্রবেশ করাইলে আমরা উদার ও সনাতন আর্য্যভাব ও শিক্ষা হইতে ভ্রষ্ট হই। সমস্ত জীবন ধর্ম্মক্ষেত্র, সংসারও ধর্ম্ম। কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোচনা ও ভক্তির ভাব ধর্ম্ম নহে, কর্ম্মও ধর্ম্ম। আমাদের সমস্ত সাহিত্য ব্যাপ্ত করিয়া এই মহতী শিক্ষা সনাতন ভাবে রহিয়াছে—এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

অনেকের ধারণা যে কর্ম্ম ধর্ম্মের অঙ্গ বটে, কিন্তু সর্ব্ববিধ কর্ম্ম নহে ; কেবল যেগুলি সাত্ত্বিকভাবাপন্ন, নিবৃত্তির অনুকূল, সেইগুলি এই নামের যোগ্য। ইহাও ভ্রান্ত ধারণা। যেমন সাত্ত্বিক-কর্ম্ম ধর্ম্ম, তেমনই রাজসিক-কর্ম্মও ধর্ম্ম। যেমন জীবের

উপর দয়া করা ধর্ম্ম, তেমনই ধর্ম্মযুদ্ধে দেশের শত্রুকে হনন করাও ধর্ম্ম। যেমন পরোপকারার্থে নিজের সুখ, ধন ও প্রাণ পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দেওয়া ধর্ম্ম, তেমনই ধর্ম্মের সাধন শরীরকে উচিতভাবে রক্ষা করাও ধর্ম্ম। রাজনীতিও ধর্ম্ম, কাব্যরচনাও ধর্ম্ম, চিত্রলিখনও ধর্ম্ম, মধুর গানে পরের মনোরঞ্জন সম্পাদনও ধর্ম্ম। যাহার মধ্যে স্বার্থ নাই, তাহাই ধর্ম্ম, সেই কর্ম্ম বড় হউক, ছোট হউক। ছোট-বড় আমরা হিসাব করিয়া দেখি, ভগবানের নিকট ছোট বড় নাই, কোন্ ভাবে মানুষ নিজ স্বভাবোচিত বা অদৃষ্টদত্ত কর্ম্ম আচরণ করে তিনি সেই দিকেই লক্ষ্য রাখেন। উচ্চ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এই, যে-কর্ম্মই করি, তাহা তাঁহারই চরণে অর্পণ করা, যজ্ঞ বলিয়া করা, তাঁহার প্রকৃতিদ্বারা কৃত বলিয়া সমভাবে স্বীকার করা।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

অর্থাৎ যাহা দেখি, যাহা করি, যাহা ভাবি, সবই তাঁহার মধ্যে দেখা, তাঁহার চিন্তায় যেন বস্ত্রে আচ্ছাদিত করা হইল শ্রেষ্ঠ পথ, সেই আবরণকে পাপ ও অধর্ম্ম ভেদ করিতে অসমর্থ। মনের মধ্যে সকল কর্ম্মে বাসনা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া কিছু না কামনা করিয়া কর্ম্মের স্রোতে যাহা পাই, তাহা ভোগ করিব, সকল কর্ম্ম করিব, দেহ রক্ষা করিব, ইহাই ভগবানের প্রিয় আচরণ এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহাই প্রকৃত নিবৃত্তি। বুদ্ধিই নিবৃত্তির

স্থান, প্রাণে ও ইন্দ্রিয়ে প্রবৃত্তির ক্ষেত্র। বুদ্ধি প্রবৃত্তি দ্বারা স্পৃষ্ট হয় বলিয়া যত গোল। বুদ্ধি নির্লিপ্তভাবে সাক্ষী ও ভগবানের prophet বা spokesman হইয়া থাকিবে, নিষ্কাম হইয়া তাঁহার অনুমোদিত প্রেরণা প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে জ্ঞাপন করিয়া দিবে ; প্রাণ ও ইন্দ্রিয় তদনুসারে স্ব স্ব কৰ্ম্ম করিবে। কৰ্ম্মত্যাগ অতি ক্ষুদ্র, কামনার ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ। শরীরের নিবৃত্তি নিবৃত্তি নহে, নির্লিপ্ততাই প্রকৃত নিবৃত্তি।

উপনিষদ

আমাদের ধর্ম্ম অতি বিশাল ও নানা শাখা-প্রশাখা শোভিত। তাহার মূল গভীরতম জ্ঞানে আরূঢ়, তাহার শাখাগুলি কর্ম্মের অতি দূর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যেমন গীতার অশ্বত্থবৃক্ষ, ঊর্দ্ধমূল ও অধঃশাখঃ, তেমনই এই ধর্ম্ম জ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত, কর্ম্মপ্রেরক। নিবৃত্তি তাহার ভিত্তি, প্রবৃত্তি তাহার গৃহ, ছাদ দেওয়াল, মুক্তি তাহার চূড়া। মানবজাতির সমস্ত জীবন এই বিশাল হিন্দুধর্ম্ম-বৃক্ষের আশ্রিত।

সকলে বলে বেদ হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু অল্প লোকেই সেই প্রতিষ্ঠার স্বরূপ ও মর্ম্ম অবগত আছে; প্রায়ই শাখাগ্রে বসিয়া আমরা দুই-একটি সুস্বাদু নশ্বর ফলের আস্বাদে মজিয়া থাকি, মূলের কোনও সন্ধান রাখি না। আমরা শুনিয়াছি বটে যে বেদের দুইভাগ আছে, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, কিন্তু আসল কর্ম্মকাণ্ড কি বা জ্ঞানকাণ্ড কি তাহা জানি না। আমরা মোক্ষ-মূল্লর কৃত ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা পড়িয়া থাকিতে পারি বা রমেশচন্দ্র দত্তের বাঙ্গালা অনুবাদ পড়িয়া থাকিতে পারি, কিন্তু ঋগ্বেদ কি তাহা জানি না। মোক্ষমূল্লর ও দত্ত মহাশয়ের নিকট এই জ্ঞান

পাইয়াছি যে ঋগ্বেদের ঋষিগণ প্রকৃতির বাহ্য পদার্থ বা ভূত-সকলকে পূজা করিতেন, সূর্য্য চন্দ্র বায়ু অগ্নি ইত্যাদির স্তব-স্তোত্রই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সেই অনাদ্যনন্ত অপৌরুষেয় মূল জ্ঞান। আমরা ইহাই বিশ্বাস করিয়া বেদের, ঋষিদের ও হিন্দু-ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া মনে করি যে আমরা বড়ই বিদ্বান, বড়ই "আলোকপ্রাপ্ত"। আসল বেদে সত্য সত্য কি আছে, কেনইবা শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাজ্ঞানী ও মহাপুরুষগণ এই স্তবস্তোত্র-গুলিকে অনাদ্যনন্ত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত জ্ঞান বলিয়া মানিতেন, তাহার কোন অনুসন্ধান করি না।

উপনিষদইবা কি, তাহাও অত্যল্প লোক জানে। যখন উপনিষদের কথা বলি, আমরা প্রায়ই শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ ইত্যাদি দার্শনিক ব্যাখ্যার কথা ভাবি। আসল উপনিষদে কি লেখা রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থ কি, কেন পরস্পরবিরোধী ষড়দর্শন এই এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ষড়্‌দর্শনের অতীত কোন্ নিগূঢ় অর্থ সেই জ্ঞানভাণ্ডারে লভ্য হয়, এই চিন্তাও করি না। শঙ্কর যে অর্থ করিয়া গিয়াছেন, আমরা সহস্র বর্ষকাল সেই অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, শঙ্করের ব্যাখ্যাই আমাদের বেদ, আমাদের উপনিষদ, কষ্ট করিয়া আসল উপনিষদ কে পড়ে? যদি পড়ি, শঙ্করের ব্যাখ্যার বিরোধী কোন ব্যাখ্যা দেখিলে আমরা তখনই তাহা ভুল বলিয়া প্রত্যাখ্যান করি। অথচ উপনিষদের মধ্যে কেবল শঙ্করলব্ধ জ্ঞান নহে, ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যতে যে আধ্যাত্মিক

জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লব্ধ হইয়াছে বা হইবে, সেইগুলি আর্য্য ঋষি ও মহাযোগী অতি সংক্ষিপ্তভাবে নিগূঢ় অর্থপ্রকাশক শ্লোকে নিহিত করিয়া গিয়াছেন।

উপনিষদ কি? যে অনাদ্যনন্ত গভীরতম সনাতন জ্ঞানে সনাতন ধর্ম্ম আরূঢ়মূল, সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার উপনিষদ। চতুর্ব্বেদের সূক্তাংশে সেই জ্ঞান পাওয়া যায়, কিন্তু উপমাচ্ছলে স্তোত্রের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা আচ্ছাদিত, যেমন আদর্শে মানবের প্রতিমূর্ত্তি। উপনিষদ অনাচ্ছন্ন পরমজ্ঞান, আসল মনুষ্যের অনাবৃত অবয়ব। ঋগ্বেদের বক্তা ঋষিগণ ঐশ্বরিক প্রেরণায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান শব্দ ও ছন্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন, উপনিষদের ঋষিগণ সাক্ষাদ্দর্শনে সেই জ্ঞানের স্বরূপ দেখিয়া অল্প ও গম্ভীর কথায় সেই জ্ঞান ব্যক্ত করিলেন। অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি কেন, তাহার পরে যত দার্শনিক চিন্তা ও বাদ ভারতে, য়ুরোপে, এসিয়ায় সৃষ্ট হইয়াছে, Nominalism, Realism, শূন্যবাদ, ডারউয়িনের ক্রমবিকাশ, কম্‌তের Positivism, হেগেল, কান্ত, স্পিনোজা শোপনহাওর, Utilitarianism, Hedonism, সকলই উপনিষদের ঋষিগণের সাক্ষাদ্দর্শনে দৃষ্ট ও ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যত্র যাহা খণ্ডভাবে দৃষ্ট, সত্যের অংশমাত্র হইয়াও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রচারিত, সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত করিয়া বিকৃতভাবে বর্ণিত, তাহা উপনিষদে সম্পূর্ণভাবে, নিজ প্রকৃত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, শুদ্ধ অভ্রান্তভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব শঙ্করের ব্যাখ্যায় বা আর-কাহারও ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ না

হইয়া উপনিষদের আসল গভীর ও অখণ্ড অর্থগ্রহণে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

উপনিষদের অর্থ গূঢ় স্থানে প্রবেশ করা। ঋষিগণ তর্কের বলে, বিদ্যার প্রসারে, প্রেরণার স্রোতে উপনিষদুক্ত জ্ঞানলাভ করেন নাই, যে গূঢ়স্থানে সম্যক্ জ্ঞানের চাবি মনের নিভৃত কক্ষে ঝুলান রহিয়াছে, যোগদ্বারা অধিকারী হইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই চাবি নামাইয়া তাঁহারা অভ্রান্ত জ্ঞানের বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। সেই চাবি হস্তগত না হইলে উপনিষদের প্রকৃত অর্থ খুলিয়া যায় না। কেবল তর্কবলে উপনিষদের অর্থ করা ও নিবিড় অরণ্যে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষাগ্রে মোম-বাতির আলোকে নিরীক্ষণ করা একই কথা। সাক্ষাদ্দর্শনই সূর্য্যালোক, যাহা দ্বারা সমস্ত অরণ্য আলোকিত হইয়া অন্বেষণ-কারীর নয়নগোচর হয়। সাক্ষাদ্দর্শন যোগেই লভ্য।

পুরাণ

পূর্ব্ব প্রবন্ধে উপনিষদের কথা লিখিয়াছি এবং উপনিষদের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিবার প্রণালী দেখাইয়াছি। উপনিষদ যেমন হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ, পুরাণও প্রমাণ; শ্রুতি যেমন প্রমাণ, স্মৃতিও প্রমাণ, কিন্তু একদরের নহে। শ্রুতি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের সঙ্গে যদি স্মৃতির বিরোধ হয়, তাহা হইলে স্মৃতির প্রমাণ গ্রহণীয় নহে। যাহা যোগসিদ্ধ দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত ঋষিগণ দর্শন করিয়াছেন, অন্তর্য্যামী জগদ্গুরু তাঁহাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে শ্রবণ করাইয়াছেন, তাহাই শ্রুতি। প্রাচীন জ্ঞান ও বিদ্যা, যাহা পুরুষপরম্পরায় রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাই স্মৃতি। শেষোক্ত জ্ঞান অনেকের মুখে অনেকের মনে পরিবর্ত্তিত, বিকৃতও হইয়া আসিতে পারে, অবস্থান্তরে নূতন নূতন মত ও প্রয়োজনের অনুকূল নূতন আকার ধারণ করিয়া আসিতে পারে। অতএব স্মৃতি শ্রুতির ন্যায় অভ্রান্ত বলা যায় না। স্মৃতি অপৌরুষেয় নহে, মনুষ্যের সীমাবদ্ধ পরিবর্ত্তনশীল মত ও বুদ্ধির সৃষ্টি।

পুরাণ স্মৃতির মধ্যে প্রধান। উপনিষদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পুরাণে উপন্যাস ও রূপকাকারে পরিণত হইয়াছে, তাহার মধ্যে

ভারতের ইতিহাস, হিন্দুধর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও অভিব্যক্তি, পুরাতন সামাজিক অবস্থা, আচার, পূজা, যোগসাধন, চিন্তা-প্রণালীর অনেক আবশ্যক কথা পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন পুরাণ-কার প্রায় সকলে হয় সিদ্ধ, নয় সাধক; তাঁহাদের জ্ঞান ও সাধনলব্ধ উপলব্ধি তাঁহাদের রচিত পুরাণে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বেদ ও উপনিষদ হিন্দুধর্ম্মের আসল গ্রন্থ, পুরাণ সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা আসল গ্রন্থের সমান হইতে পারে না। তুমি যে ব্যাখ্যা কর আমি সেই ব্যাখ্যা না-ও করিতে পারি, কিন্তু আসল গ্রন্থ পরিবর্ত্তন বা অগ্রাহ্য করিবার কাহারও অধিকার নাই। যাহা বেদ ও উপনিষদের সঙ্গে মিলে না, তাহা হিন্দু-ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, কিন্তু পুরাণের সঙ্গে মিল না হইলেও নূতন চিন্তা গৃহীত হইতে পারে। ব্যাখ্যার মূল্য ব্যাখ্যাকর্ত্তার মেধাশক্তি, জ্ঞান ও বিদ্যার উপরে নির্ভর করে। যেমন, ব্যাসদেবের রচিত পুরাণ যদি বিদ্যমান থাকিত, তাহার আদর প্রায় শ্রুতির সমান হইত; তাহার অভাবে ও লোমহর্ষণ রচিত পুরাণের অভাবে যে অষ্টাদশ পুরাণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে সকলের সমান আদর না করিয়া বিষ্ণু ও ভাগ-বত পুরাণের ন্যায় যোগসিদ্ধ ব্যক্তির রচনাকে অধিক মূল্যবান বলিতে হয়, মার্কণ্ডেয় পুরাণের মত পণ্ডিত অধ্যাত্মবিদ্যাপরায়ণ লেখকের রচনাকে শিব বা অগ্নিপুরাণ অপেক্ষা গভীর জ্ঞানপূর্ণ বলিয়া চিনিতে হয়। তবে ব্যাসদেবের পুরাণ যখন আধুনিক পুরাণগুলির আদিগ্রন্থ, এইগুলির মধ্যে যেটি নিকৃষ্ট তাহাতেও

হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বপ্রকাশক অনেক কথা নিশ্চয় রহিয়াছে, এবং যখন নিকৃষ্ট পুরাণও জিজ্ঞাসু বা ভক্ত যোগাভ্যাসরত সাধকের লেখা, তখন রচয়িতার স্বপ্রয়াস-লব্ধ জ্ঞান ও চিন্তাও আদরণীয়।

বেদ ও উপনিষদ হইতে পুরাণকে স্বতন্ত্র করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম ও পৌরাণিক ধর্ম্ম বলিয়া ইংরাজীশিক্ষিত লোক যে মিথ্যা ভেদ করিয়াছে, তাহা ভ্রম ও অজ্ঞানসম্ভূত। বেদ ও উপনিষদের জ্ঞান সর্ব্বসাধারণকে বুঝায়, ব্যাখ্যা করে, বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে, জীবনের সামান্য সামান্য কার্য্যে লাগাইবার চেষ্টা করে বলিয়া পুরাণ হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণের মধ্যে গৃহীত। যাঁহারা বেদ ও উপনিষদ ভুলিয়া পুরাণকে স্বতন্ত্র ও যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় মূল বাদ দেওয়ায় ভ্রম ও মিথ্যাজ্ঞানকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, বেদের অর্থ লোপ পায়, পুরাণের প্রকৃত অর্থও লোপ পায়। বেদের উপর পুরাণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুরাণের উপযোগ করিতে হয়।

প্রাকাম্য

১

লোকে যখন অষ্টসিদ্ধির কথা বলে, তখন অলৌকিক যোগ-প্রাপ্ত কয়েকটি অপূর্ব্ব শক্তির কথা ভাবে। অবশ্য অষ্টসিদ্ধির পূর্ণবিকাশ যোগীরই হয়, কিন্তু এই শক্তিসকল প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহে, বরং আমরা যাহাকে প্রকৃতির নিয়ম বলি, তাহা অষ্টসিদ্ধির সমাবেশ।

অষ্টসিদ্ধির নাম মহিমা, লঘিমা, অণিমা, প্রাকাম্য, ব্যাপ্তি, ঐশ্বর্য্য, বশিতা, ঈশিতা। এইগুলিই পরমেশ্বরের অষ্ট স্বভাব-সিদ্ধ শক্তি বলিয়া পরিচিত। প্রাকাম্য ধর,—প্রাকাম্যের অর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বিকাশ ও অবাধ ক্রিয়া। বাস্তবিক, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের সকল ক্রিয়া প্রাকাম্যের অন্তর্গত। প্রাকা-ম্যের বলে চক্ষুতে দেখে, কাণে শোনে, নাকে আঘ্রাণ লয়, ত্বকে স্পর্শ অনুভব করে, রসনায় রসাস্বাদন করে, মনে বাহ্যস্পর্শ-সকল আদায় করে। সাধারণ লোকে ভাবে, স্থূল ইন্দ্রিয়েই জ্ঞানধারণের শক্তি; তত্ত্ববিদ্ জানে চোখ দেখে না, মন দেখে, কাণ শোনে না, মন শোনে, নাক আঘ্রাণ করে না, মন আঘ্রাণ

করে। যাঁহারা আরও তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহারা জানেন মনও দেখে না, শোনে না, আঘ্রাণ করে না, জীব দেখে, শোনে, আঘ্রাণ করে। জীবই জ্ঞাতা। জীব ঈশ্বর, ভগবানের অংশ। ভগবানের অষ্টসিদ্ধি জীবেরও অষ্টসিদ্ধি।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি স যাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥

আমার সনাতন অংশ জীবলোকে জীব হইয়া মন ও পঞ্চেন্দ্রিয় প্রকৃতির মধ্যে পাইয়া আকর্ষণ করে (নিজ উপযোগে লাগায় ও ভোগের জন্য আয়ত্ত করে)। যখন জীবরূপ ঈশ্বর শরীরলাভ করেন বা শরীর হইতে নির্গমন করেন, তখন যেমন বায়ু গন্ধকে ফুল ইত্যাদি হইতে লইয়া যায়, তেমনই শরীর হইতে ইন্দ্রিয়সকল লইয়া যান। শ্রোত্র, চক্ষু, স্পর্শ, আস্বাদ, ঘ্রাণ ও মন অধিষ্ঠান করিয়া এই ঈশ্বর বিষয় ভোগ করেন। দৃষ্টি, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, মনন এইগুলিই প্রাকাম্যের ক্রিয়া। ভগবানের সনাতন অংশ জীব এই প্রকৃতির ক্রিয়া লইয়া প্রকৃতির বিকারে পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন সূক্ষ্মশরীরে বিকাশ করেন, স্থূলশরীর লাভ করিবার সময় এই ষড়িন্দ্রিয় লইয়া প্রবেশ করেন, মৃত্যুকালে এই ষড়িন্দ্রিয় লইয়া নির্গমন করেন। সূক্ষ্মদেহেই হউক,

স্থূল দেহেই হউক, তিনি এই ষড়িন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয়-সকল ভোগ করেন।

কারণদেহে সম্পূর্ণ প্রাকাম্য থাকে, সেই শক্তি সূক্ষ্মদেহে বিকাশলাভ করে, পরে স্থূলদেহে বিকশিত হয়। কিন্তু প্রথম হইতে স্থূলে সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না, জগতের ক্রমবিকাশে ইন্দ্রিয়-সকল ক্রমে বিকশিত হয়, শেষে কয়েকটি পশুর মধ্যে মানুষের উপযোগী বিকাশ ও প্রাখর্য্য লাভ করে। মানুষের মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয় অল্প নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কারণ আমরা মন ও বুদ্ধির বিকাশে অধিক শক্তি প্রয়োগ করি। কিন্তু এই অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রাকাম্য বিকাশের শেষ অবস্থা নয়। যোগ দ্বারা সূক্ষ্মদেহে যত প্রাকাম্য বিকাশ হইয়াছে, তাহা স্থূলদেহেও প্রকাশ পায়। ইহাকেই যোগপ্রাপ্ত প্রাকাম্য সিদ্ধি বলে।

২

পরমেশ্বর অনন্ত ও অপরাহত-পরাক্রম, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শক্তিরও ক্ষেত্র অনন্ত ও ক্রিয়া অপরাহত। জীব ঈশ্বর, ভগবানের অংশ, সূক্ষ্মদেহে ও স্থূলদেহে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে ঐশ্বরিক শক্তি বিকাশ করিতেছেন। স্থূল শরীরের ইন্দ্রিয়সকল বিশেষতঃ সীমাবদ্ধ, মানুষ যতদিন স্থূলদেহের শক্তিদ্বারা আবদ্ধ থাকে, ততদিন বুদ্ধিবিকাশেই সে পশুর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, নচেৎ ইন্দ্রিয়ের প্রাখর্য্যে এবং মনের অভ্রান্ত ক্রিয়াতে—এক কথায়, প্রাকাম্য সিদ্ধিতে—পশুই উৎকৃষ্ট। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যাহাকে instinct

বলে, তাহা এই প্রাকাম্য। পশুর মধ্যে বুদ্ধির অত্যল্প বিকাশ হইয়াছে, অথচ এই জগতে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে এমন কোন বৃত্তির দরকার যে পথপ্রদর্শক হইয়া সর্ব্বকার্য্যে কি অনুষ্ঠেয়, কি বর্জ্জনীয়, তাহা দেখাইয়া দিবে। পশুর মনই এই কার্য্য করে। মানুষের মন কিছু নির্ণয় করে না, বুদ্ধিই নিশ্চয়াত্মক, বুদ্ধিই নির্ণয় করে, মন কেবল সংস্কারসৃষ্টির যন্ত্র। আমরা যাহা দেখি, শুনি, বোধ করি, তাহা মনে সংস্কাররূপে পরিণত হয়, বুদ্ধি সেই সংস্কারগুলি গ্রহণ করে, প্রত্যাখ্যান করে, উহা লইয়া চিন্তা সৃষ্টি করে। পশুর বুদ্ধি এই নির্ণয়কর্ম্মে অপারগ; বুদ্ধি দ্বারা নহে, মন দ্বারা পশু বুঝে, চিন্তা করে। মনের এক অদ্ভুত শক্তি আছে, অন্য মনে যাহা হইতেছে, তাহা এক মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারে, বিচার না করিয়া যাহা প্রয়োজন, তাহা বুঝিয়া লয় এবং কর্ম্মের উপযুক্ত প্রণালী ঠিক করে। আমরা কাহাকেও ঘরে প্রবেশ করিতে দেখি নাই, অথচ জানি যেন কে ঘরে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে; কোন ভয়ের কারণ নাই, অথচ আশঙ্কিত হইয়া থাকি, কোথা হইতে যেন গুপ্ত ভয়ের কারণ রহিয়াছে; বন্ধু এক কথাও বলে নাই, অথচ বলিবার পূর্ব্বেও কি বলিবে, তাহা বুঝিয়া লইলাম, ইত্যাদি অনেক উদাহরণ দেওয়া হয়; এ সকলই মনের শক্তি, একাদশ ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক অবাধ ক্রিয়া। কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে সর্ব্ব কার্য্য করিতে আমরা এত অভ্যস্ত হইয়াছি যে, এই ক্রিয়া, এই প্রাকাম্য আমাদের মধ্যে প্রায় লোপ পাইয়াছে। পশু এই

প্রাকাম্যকে আশ্রয় না করিলে দুদিনে মরিয়া যাইবে। কি পথ্য, কি অপথ্য, কে মিত্র, কে শত্রু, কোথায় ভয়, কোথায় নিরাপদ, প্রাকাম্যই এই সকল জ্ঞান পশুকে দেয়। এই প্রাকাম্য দ্বারা কুকুর প্রভুর ভাষা না বুঝিয়াও তাহার কথার অর্থ বা মনের ভাব বুঝিতে পারে। এই প্রাকাম্য দ্বারা ঘোড়া যে পথে একবার গিয়াছে, সেই পথ চিনিয়া রাখে। এই সকল প্রাকাম্য-ক্রিয়া মনের। কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তিতেও পশু মানুষকে হারাইয়া দেয়। কোন্ মানুষ কুকুরের ন্যায় শুধু গন্ধ অনুসরণ করিয়া একশত মাইল আর সকলের পথ ত্যাগ করিয়া একটি বিশিষ্ট জন্তুর পশ্চাৎ অভ্রান্তভাবে অনুসরণ করিতে সমর্থ? বা পশুর ন্যায় অন্ধকারে দেখিতে পায়? বা কেবল শ্রবণ দ্বারা গুপ্ত শব্দকারীকে বাহির করিতে পারে? Telepathy বা দূরে চিন্তাগ্রহণ সিদ্ধির কথা বলিয়া কোন এক ইংরাজী সংবাদ পত্র বলিয়াছে, telepathy মনের প্রক্রিয়া, পশুর সেই সিদ্ধি আছে, মানুষের নাই, অতএব telepathyর বিকাশে মানুষের উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবে। স্থূলবুদ্ধি বৃটনের উপযুক্ত তর্ক বটে! অবশ্য মানুষ বুদ্ধিবিকাশের জন্য একাদশ ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বিকাশে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে, নচেৎ প্রয়োজনের অভাবে তাহার বুদ্ধিবিকাশ এত শীঘ্র হইত না। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ ও নিখুঁত বুদ্ধিবিকাশ হইয়াছে, তখন একাদশ ইন্দ্রিয়ের পুনর্বিকাশ করা মানবজাতির কর্ত্তব্য। ইহাতে বুদ্ধির বিচার্য্য জ্ঞান বিস্তারিত হইবে, মনুষ্যও মন এবং বুদ্ধির সম্পূর্ণ

অনুশীলনে অন্তর্নিহিত দেবত্বপ্রকাশের উপযুক্ত পাত্র হইবে। কোনও শক্তিবিকাশ অবনতির কারণ হইতে পারে না—কেবল শক্তির অবৈধ প্রয়োগে, মিথ্যা ব্যবহারে, অসামঞ্জস্য দোষে অবনতি সম্ভব। অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে যাহাতে বোঝা যায় যে একাদশ ইন্দ্রিয়ের পুনর্বিকাশ, প্রাকাম্যের বৃদ্ধি আরম্ভ করিবার দিন আসিয়াছে।

বিশ্বরূপদর্শন

গীতায় বিশ্বরূপ

"বন্দেমাতরম্" শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিপিনচন্দ্র পাল কথা প্রসঙ্গে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শনের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে গীতার একাদশ অধ্যায়ে যে বিশ্বরূপদর্শনের বর্ণনা লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অসত্য, কবির কল্পনা মাত্র। আমরা এই কথার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য। বিশ্বরূপদর্শন গীতার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অর্জ্জুনের মনে যে দ্বিধা ও সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ তর্ক ও জ্ঞানগর্ভ উক্তি দ্বারা নিরসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তর্ক ও উপদেশ দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা অদৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, যে জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়াছে, সেই জ্ঞানেরই দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হয়। সেইজন্য অর্জ্জুন অন্তর্য্যামীর অলক্ষিত প্রেরণায় বিশ্বরূপদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। বিশ্বরূপদর্শনে অর্জ্জুনের সন্দেহ চিরকালের জন্য তিরোহিত হইল, বুদ্ধি পূত ও বিশুদ্ধ হইয়া গীতার পরম রহস্য গ্রহণের যোগ্য হইল। বিশ্বরূপদর্শনের পূর্ব্বে গীতায় যে জ্ঞান কথিত হইয়াছিল,

তাহা সাধকের উপযোগী জ্ঞানের বহিরঙ্গ; সেই রূপদর্শনের পরে যে জ্ঞান কথিত হয়, সেই জ্ঞান গূঢ় সত্য, পরম রহস্য, সনাতন শিক্ষা। এই বিশ্বরূপদর্শনের বর্ণনাকে যদি কবির উপমা বলি, গীতার গাম্ভীর্য্য, সত্যতা ও গভীরতা নষ্ট হয়, যোগলব্ধ গভীরতম শিক্ষা কয়েকটি দার্শনিক মত ও কবির কল্পনার সমাবেশে পরিণত হয়। বিশ্বরূপদর্শন কল্পনা নয়, উপমা নয়, সত্য; অতিপ্রাকৃত সত্য নহে,—কেননা বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর্গত, বিশ্বরূপ অতিপ্রাকৃত হইতে পারে না। বিশ্বরূপ কারণজগতের সত্য, কারণজগতের রূপ দিব্যচক্ষুতে প্রকাশ হয়। দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত অর্জ্জুন কারণজগতের বিশ্বরূপ দেখিলেন।

•

সাকার ও নিরাকার

যাঁহারা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা গুণ ও আকারের কথা রূপক ও উপমা বলিয়া উড়াইয়া দেন; যাঁহারা সগুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা শাস্ত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া নির্গুণত্ব অস্বীকার করেন এবং আকারের কথা রূপক ও উপমা বলিয়া উড়াইয়া দেন। সগুণ সাকার ব্রহ্মের উপাসক এই দুইজনেরই উপর খড়্গহস্ত। আমরা এই তিন মতকেই সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানসম্ভূত বলি। কেননা যাঁহারা সাকার ও নিরাকার, দ্বিবিধ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপে একেকে সত্য, অপরকে অসত্য কল্পনা বলিয়া জ্ঞানের

অন্তিম প্রমাণ নষ্ট করিবেন এবং অসীম ব্রহ্মকে সীমার অধীন করিবেন? যদি ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও নিরাকারত্ব অস্বীকার করি, আমরা ভগবানকে খেলো করি, এই কথা সত্য; কিন্তু যদি ব্রহ্মের সগুণত্ব ও সাকারত্ব অস্বীকার করি, আমরা ভগবানকে খেলো করি, এই কথাও সত্য। ভগবান রূপের কর্ত্তা, স্রষ্টা, অধীশ্বর, তিনি কোন রূপে আবদ্ধ নহেন; কিন্তু যেমন সাকারত্ব দ্বারা আবদ্ধ নহেন, সেইরূপ নিরাকারত্ব দ্বারাও আবদ্ধ নহেন। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, স্থূলপ্রকৃতির নিয়ম বা দেশকালের নিয়মরূপ জালে তাঁহাকে ধরিবার ভান করিয়া আমরা যদি বলি, তুমি যখন অনন্ত, আমি তোমাকে সান্ত হইতে দিব না, চেষ্টা কর দেখি, তুমি পারিবে না, তুমি আমার অকাট্য তর্ক ও যুক্তিতে আবদ্ধ, যেমন প্রস্পেরোর ইন্দ্রজালে ফার্ডিনান্দ—এ কি হাস্যকর কথা, এ কি ঘোর অহঙ্কার ও অজ্ঞান। ভগবান বন্ধনরহিত, নিরাকার ও সাকার, সাধককে সাকার হইয়া দর্শন দেন,—সেই আকারে পূর্ণ ভগবান রহিয়াছেন অথচ সেই সময়েই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। কেননা ভগবান দেশ-কালাতীত অতর্কগম্য, দেশ ও কাল তাঁহার খেলার সামগ্রী, দেশ ও কাল রূপ জাল ফেলিয়া সর্ব্বভূতকে ধরিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, আমরা কিন্তু তাঁহাকে সেই জালে ধরিতে পারিব না। যতবার তর্ক ও দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই অসাধ্য সাধন করিতে যাই, ততবার রঙ্গময় সেই জালকে সরাইয়া আমাদের অগ্রে, পিছনে, পার্শ্বে, দূরে, চারিদিকে মৃদু মৃদু হাসিয়া বিশ্বরূপ

ও বিশ্বাতীত রূপ প্রসার করিয়া বুদ্ধিকে পরাস্ত করে। যে বলে আমি তাঁহাকে জানিতে পারিলাম, সে কিছুই জানে না; যে বলে আমি জানি অথচ জানি না, সেই প্রকৃত জ্ঞানী।

বিশ্বরূপ

যিনি শক্তির উপাসক, কর্ম্মযোগী, যন্ত্রীর যন্ত্র হইয়া ভগবদ্-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে আদিষ্ট, তাঁহার চক্ষে বিশ্বরূপদর্শন অতি প্রয়োজনীয়। বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ব্বেও তিনি আদেশলাভ করিতে পারেন, কিন্তু সেই দর্শনলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আদেশ ঠিক মঞ্জুর হয় না, রুজু হইয়াছে, পাশ হয় নাই। সেই পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্ম-শিক্ষার ও তৈয়ারী হইবার সময়। বিশ্বরূপদর্শনে কর্ম্মের আরম্ভ। বিশ্বরূপদর্শন অনেক প্রকার হইতে পারে—যেমন সাধনা, যেমন সাধকের স্বভাব। কালীর বিশ্বরূপদর্শনে সাধক জগৎময় অপরূপ নারীরূপ দেখেন, এক অথচ অগণন দেহযুক্ত, সর্ব্বত্র সেই নিবিড়-তিমির-প্রসারক ঘনকৃষ্ণ কুন্তলরাশি আকাশ ছাইয়া রহিয়াছে, সর্ব্বত্র সেই রক্তাক্ত খড়্গের আভা নয়ন ঝলসিয়া নৃত্য করিতেছে, জগৎময় সেই ভীষণ অট্টহাসির স্রোত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতেছে। এই সকল কথা কবির কল্পনা নহে, অতিপ্রাকৃত উপলব্ধিকে অসম্পূর্ণ মানবভাষায় বর্ণনা করিবার বিফল চেষ্টা নহে। ইহা কালীর আত্মপ্রকাশ, ইহা আমাদের মায়ের প্রকৃত রূপ,—যাহা দিব্যচক্ষুতে দেখা হইয়াছে, তাহার

অনতিরঞ্জিত সরল সত্য বর্ণনা। অর্জ্জুন কালীর বিশ্বরূপ দেখেন নাই, দেখিয়াছিলেন কালরূপ শ্রীকৃষ্ণের সংহারক বিশ্বরূপ। একই কথা। দিব্যচক্ষুতে দেখিলেন, বাহ্যজ্ঞানহীন সমাধিতে নহে—যাহা দেখিলেন, ব্যাসদেব তাহার অবিকল অনতিরঞ্জিত বর্ণনা করিলেন। স্বপ্ন নহে, কল্পনা নহে—সত্য, জাগ্রত সত্য।

কারণজগতের রূপ

ভগবদ্-অধিষ্ঠিত তিন অবস্থার কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—প্রাজ্ঞ-অধিষ্ঠিত সুষুপ্তি, তৈজস বা হিরণ্যগর্ভ-অধিষ্ঠিত স্বপ্ন, বিরাট-অধিষ্ঠিত জাগ্রত। প্রত্যেক অবস্থা এক এক জগৎ। সুষুপ্তিতে কারণজগৎ, স্বপ্নে সূক্ষ্মজগৎ, জাগ্রতে স্থূলজগৎ। কারণে যাহা নির্ণীত হয় আমাদের দেশ-কালের অতীত সূক্ষ্মে তাহা প্রতিভাসিত, ও স্থূলে আংশিকভাবে স্থূলজগতের নিয়ম অনুসারে অভিনীত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, আমি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পূর্ব্বেই বধ করিয়াছি, অথচ স্থূলজগতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান, জীবিত, যুদ্ধে ব্যাপৃত। ভগবানের এই কথা অসত্য নহে, উপমাও নহে। কারণজগতে তিনি তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন, নচেৎ ইহলোকে তাঁহাদের বধ অসম্ভব। আমাদের প্রকৃত জীবন কারণে, স্থূলে তাহার ছায়া মাত্র পড়ে। কিন্তু কারণজগতের নিয়ম, দেশ, কাল, রূপ, নাম স্বতন্ত্র। বিশ্বরূপ কারণের রূপ, স্থূলে দিব্যচক্ষুতে প্রকাশিত হয়।

দিব্যচক্ষু

দিব্যচক্ষু কি ? কল্পনার চক্ষু নহে, কবির উপমা নহে। যোগলব্ধ দৃষ্টির তিন প্রকার আছে—সূক্ষ্মদৃষ্টি, বিজ্ঞানচক্ষু ও দিব্যচক্ষু। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আমরা স্বপ্নে বা জাগ্রদবস্থায় মানসিক মূর্ত্তি দেখি, বিজ্ঞানচক্ষুতে আমরা সমাধিস্থ হইয়া সূক্ষ্মজগৎ ও কারণজগতের অন্তর্গত নামরূপের প্রতিমূর্ত্তি ও সাঙ্কেতিক রূপ চিত্তাকাশে দেখি, দিব্যচক্ষুতে কারণজগতের নামরূপ উপলব্ধি করি,—সমাধিতেও উপলব্ধি করি, স্থূলচক্ষুর সম্মুখেও দেখিতে পাই। যাহা স্থূলেন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহা যদি ইন্দ্রিয়গোচর হয় ইহাকে দিব্যচক্ষুর প্রভাব বুঝিতে হয়। অর্জ্জুন দিব্যচক্ষু এ ভাবে জাগ্রদবস্থায় ভগবানের কারণান্তর্গত বিশ্বরূপ দেখিয়া সন্দেহমুক্ত হইলেন। সেই বিশ্বরূপদর্শন স্থূলজগতের ইন্দ্রিয়গোচর সত্য না হউক, স্থূল সত্য অপেক্ষা সত্য—কল্পনা, অসত্য বা উপমা নহে।

স্তবস্তোত্র

সাধক, সাধন ও সাধ্য এই তিন অঙ্গ লইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। সাধকের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব থাকায় ভিন্ন ভিন্ন সাধন আদিষ্ট হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন সাধ্যও অনুসৃত হয়। কিন্তু স্থূল-দৃষ্টিতে নানা সাধ্য থাকিলেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় যে সকল সাধকের সাধ্য এক—সেই সাধ্য আত্মতুষ্টি। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বুঝাইলেন যে আত্মার জন্য সব, আত্মার জন্য স্ত্রী, আত্মার জন্য ধন, আত্মার জন্য প্রেম, আত্মার জন্য সুখ, আত্মার জন্য দুঃখ, আত্মার জন্য জীবন, আত্মার জন্য মরণ। সেইজন্য আত্মা কি এই প্রশ্নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।

অনেক বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন আত্মজ্ঞান লইয়া এত বৃথা মাথাঘামান কেন? এই সব সূক্ষ্মবিচারে সময় নষ্ট করা বাতুলতা, সংসারের প্রয়োজনীয় বিষয় ও মানবজাতির কল্যাণচেষ্টা লইয়া থাক। কিন্তু সংসারের কি কি বিষয় প্রয়োজনীয় এবং মানবজাতির কল্যাণ কিসে হইবে, এই প্রশ্নের মীমাংসাও আত্ম-জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যেমন আমার জ্ঞান, তেমনই আমার সাধ্য। আমি যদি নিজ দেহকে আত্মা বুঝি, তাহার

তুষ্টিসাধনার্থ আর-সকল বিচার ও বিবেচনাকে জলাঞ্জলি দিয়া স্বার্থপর নরপিশাচ হইয়া থাকিব। যদি স্ত্রীকেই আত্মবৎ দেখি, আত্মবৎ ভালবাসি, স্ত্রৈণ হইয়া ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়া তাহার মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব, পরকে কষ্ট দিয়া তাহারই সুখ করিব, পরের অনিষ্ট করিয়া তাহারই ইষ্ট সিদ্ধ করিব। যদি দেশকেই আত্মবৎ দেখি, আমি খুব বড় একজন দেশহিতৈষী হইব, হয়ত ইতিহাসে অমরকীর্ত্তি রাখিয়া যাইব, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরদেশের অনিষ্ট, ধনলুণ্ঠন, স্বাধীনতা অপহরণ করিতে পারি। যদি ভগবানকে আত্মা বুঝি অথবা আত্মবৎ ভালবাসি—সে একই কথা, কেননা প্রেম হইল চরমদৃষ্টি—আমি ভক্ত যোগী, নিষ্কাম কর্ম্মী হইয়া সাধারণ মনুষ্যের অপ্রাপ্য শক্তি, জ্ঞান বা আনন্দ ভোগ করিতে পারি। যদি নির্গুণ পরব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া জানি, পরম শান্তি ও লয় প্রাপ্ত হইতে পারি। যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ,— যাহার যেমন শ্রদ্ধা সে সেইরূপই হয়। মানবজাতি চিরকাল সাধন করিয়া আসিতেছে, প্রথম ক্ষুদ্র, পরে অপেক্ষাকৃত বড়, শেষে সর্ব্বোচ্চ পরাৎপর সাধ্য সাধন করিয়া গন্তব্যস্থান শ্রীহরির পরমধাম প্রাপ্ত হইতে চলিতেছে। এক যুগ ছিল, মানবজাতি কেবল শরীর সাধন করিত, শরীর সাধন সেই কালের যুগধর্ম্ম, অন্যধর্ম্মকে খাট করিয়াও তখন শরীর সাধন করা শ্রেয়ঃ পথ ছিল। কারণ, তাহা না হইলে শরীর, যে শরীর ধর্ম্মসাধনের উপায় ও প্রতিষ্ঠা, উৎকর্ষ লাভ করিত না। সেইরূপ আর-একযুগে স্ত্রী-পরিবার, আর-এক

যুগে কুল, আর-এক যুগে—যেমন আধুনিক যুগে—জাতিই সাধ্য। সর্ব্বোচ্চ পরাৎপর সাধ্য পরমেশ্বর, ভগবান। ভগবানই সকলের প্রকৃত ও পরম আত্মা, অতএব প্রকৃত ও পরম সাধ্য। সেইজন্য গীতায় বলে, সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, আমাকেই স্মরণ কর। ভগবানের মধ্যে সকল ধর্ম্মের সমন্বয় হয়, তাঁহাকে সাধন করিলে তিনিই আমাদের ভার লইয়া আমাদিগকে যন্ত্র করিয়া স্ত্রী, পরিবার, কুল, জাতি, মানবসমষ্টির পরম তুষ্টি ও পরম কল্যাণ সাধন করিবেন।

এক সাধ্যের নানা সাধকের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব থাকায় নানা সাধনও হয়। ভগবৎ সাধনের এক প্রধান উপায় স্তবস্তোত্র। স্তবস্তোত্র সকলের উপযোগী সাধন নহে। জ্ঞানীর পক্ষে ধ্যান ও সমাধি; কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্মসমর্পণ শ্রেষ্ঠ উপায়; স্তবস্তোত্র ভক্তির অঙ্গ—শ্রেষ্ঠ অঙ্গ নহে বটে, কেননা অহৈতুক প্রেম ভক্তির চরম উৎকর্ষ, সেই প্রেম ভগবানের স্বরূপ স্তবস্তোত্র দ্বারা আয়ত্ত করিয়া তাহার পরে স্তবস্তোত্রের প্রয়োজনীয়তা অতিক্রম করিয়া সেই স্বরূপ ভোগে লীন হইয়া যায়; তথাপি এমন ভক্ত নাই যে স্তবস্তোত্র না করিয়া থাকিতে পারে, যখন আর সাধনের আবশ্যকতা থাকে না, তখনও স্তবস্তোত্রে প্রাণের উচ্ছ্বাস উছলিয়া উঠে। কেবল স্মরণ করিতে হয় যে সাধন সাধ্য নহে, আমার যে সাধন, সে পরের সাধন না-ও হইতে পারে। অনেক ভক্তের এই ধারণা দেখা যায় যে, যিনি ভগবানের স্তবস্তোত্র করেন না, স্তোত্র শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করেন না, তিনি ধার্ম্মিক নহেন।

ইহা ভ্রান্তি ও সঙ্কীর্ণতার লক্ষণ। বুদ্ধ স্তবস্তোত্র করিতেন না, তথাপি কে বুদ্ধকে অধার্ম্মিক বলিবে? ভক্তিমার্গ সাধনের জন্য স্তবস্তোত্রের সৃষ্টি।

ভক্তও নানাপ্রকার, স্তবস্তোত্রেরও নানা প্রয়োগ হয়। আর্ত্ত ভক্ত দুঃখের সময়ে ভগবানের নিকট কাঁদিবার জন্য, সাহায্য প্রার্থনার জন্য, উদ্ধারের আশায় স্তবস্তোত্র করেন, অর্থার্থী ভক্ত কোনও অর্থসিদ্ধির আশায়, ধন মান সুখ ঐশ্বর্য্য জয় কল্যাণ ভুক্তি মুক্তি ইত্যাদি উদ্দেশ্য সঙ্কল্প করিয়া স্তবস্তোত্র করেন। এই শ্রেণীর ভক্ত অনেকবার ভগবানকে প্রলোভন দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিতে যান, এক-একজন অভীষ্টসিদ্ধি না পাইয়া পরমেশ্বরের উপর ভারি চটিয়া উঠেন, তাঁহাকে নিষ্ঠুর প্রবঞ্চক ইত্যাদি গালাগালি দিয়া বলেন, আর ভগবানকে পূজা করিব না, মুখ দেখিব না, কিছুতেই মানিব না। অনেকে হতাশ হইয়া নাস্তিক হন, এই সিদ্ধান্ত করেন যে, এই জগৎ দুঃখের রাজ্য, অন্যায়-অত্যাচারের রাজ্য, ভগবান নাই। এই দুই প্রকার ভক্তি, অজ্ঞ ভক্তি, তাই বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে, ক্ষুদ্র হইতেই মহতে উঠে। অবিদ্যা সাধন বিদ্যার প্রথম সোপান। বালকও অজ্ঞ, কিন্তু বালকের অজ্ঞতায় মাধুর্য্য আছে, বালকও মায়ের নিকট কাঁদিতে আসে, দুঃখের প্রতীকার চায়, নানারূপ সুখ ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছুটিয়া আসে, সাধে, কান্নাকাটি করে, না পাইলে চটিয়াও উঠে, দৌরাত্ম্য করে। জগজ্জননীও হাস্যমুখে অজ্ঞভক্তের সকল আব্দার ও দৌরাত্ম্য সহ্য করেন।

জিজ্ঞাসু ভক্ত কোন অর্থসিদ্ধির জন্য বা ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্তবস্তোত্র করেন না, তাঁহার পক্ষে স্তবস্তোত্র সুদ্ধ ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির এবং স্বীয় ভাবপুষ্টির উপায়। জ্ঞানীভক্তের পক্ষে সেই প্রয়োজনও থাকে না, কেননা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি হইয়াছে, তাঁহার ভাব সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কেবল ভাবোচ্ছ্বাসের জন্য স্তবস্তোত্রের প্রয়োজন। গীতায় বলে, এই চারিশ্রেণীর ভক্ত সকলেই উদার, কেহ উপেক্ষ-ণীয় নহে, সকলে ভগবানের প্রিয়, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞানী ও ভগবান একাত্ম। ভগবান ভক্তের সাধ্য, অর্থাৎ আত্মরূপে জ্ঞাতব্য ও প্রাপ্য, জ্ঞানীভক্তে ও ভগবানে আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধ হয়। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম—এই তিন সূত্রে আত্মা ও পরমাত্মা পরস্পরে আবদ্ধ। কর্ম্ম আছে, সেই কর্ম্ম ভগবদ্দত্ত, তাহার মধ্যে কোন প্রয়োজন বা স্বার্থ নাই, প্রার্থনীয় কিছুই নাই; প্রেম আছে, সেই প্রেম কলহ ও অভিমানশূন্য —নিঃস্বার্থ, নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল; জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান শুষ্ক ও ভাবরহিত নহে, গভীর, তীব্র আনন্দ ও প্রেমে পূর্ণ। সাধ্য এক হইলেও যেমন সাধক তেমনই সাধন, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন সাধকের এক সাধনের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ।

জাতীয়তা

নবজন্ম

গীতায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাহারা যোগ-পথে প্রবেশ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতে স্খলিতপদ ও যোগভ্রষ্ট হন, তাঁহাদের কি গতি হয়? তাঁহারা কি ঐহিক ও পারত্রিক উভয় ফলে বঞ্চিত হইয়া বায়ুখণ্ডিত মেঘের মত বিনষ্ট হন?" উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ইহলোকে বা পরলোকে সেইরূপ ব্যক্তির বিনাশ অসম্ভব। কল্যাণকৃৎ কখনও দুর্গতি-প্রাপ্ত হন না। পুণ্যলোকসকলে তাঁহার গতি হয়, সেখানে অনেককাল বাস করিয়া শুদ্ধ শ্রীমান্ পুরুষদের গৃহে অথবা যোগ-যুক্ত মহাপুরুষদের কুলে দুর্লভ জন্ম হয়, সেই জন্মে পূর্ব্বজন্মপ্রাপ্ত যোগলিপ্সাচালিত হইয়া সিদ্ধির জন্য আরও চেষ্টা করেন, শেষে অনেক জন্মের অভ্যাসে পাপমুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করেন।" যে পূর্ব্বজন্মবাদ চিরকাল আর্য্যধর্ম্মের যোগলব্ধ জ্ঞানের অঙ্গ-

বিশেষ, পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার প্রতিপত্তি বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার পরে বেদান্তশিক্ষাপ্রচারে ও গীতার অধ্যয়নে সেই সত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। স্থূলজগতে যেমন Heredity প্রধান সত্য, সূক্ষ্ম-জগতে তেমনই পূর্ব্বজন্মবাদ প্রধান সত্য। শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে দুইটি সত্য নিহিত আছে। যোগভ্রষ্ট পুরুষ তাঁহার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত জ্ঞানের সংস্কারের সহিত জন্মগ্রহণ করেন, সেই সংস্কার দ্বারা বায়ুচালিত তরণীর ন্যায় যোগপথে চালিত হন। কিন্তু কর্ম্মফল প্রাপ্তির যোগ্য শরীর উৎপাদনার্থ উপযুক্ত কুলে জন্মলাভ প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট Heredity যোগ্যশরীরের উৎপাদক। শুদ্ধ শ্রীমান্ পুরুষদের গৃহে জন্ম হইলে শুদ্ধ সবল শরীর উৎপাদন সম্ভব, যোগীকুলে জন্মগ্রহণে উৎকৃষ্ট মন ও প্রাণ গঠিত হয় এবং সেইরূপ শিক্ষা ও মানসিক গতিলাভও হয়।

ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে যেন একটি নূতন জাতি পুরাতন তমঃ অভিভূত জাতির মধ্যে সৃষ্ট হইতেছে। ভারতমাতার পুরাতন সন্ততি ধর্ম্মগ্লানি ও অধর্ম্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ও সেইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া অল্পায়ু, ক্ষুদ্রাশয়, স্বার্থ-পরায়ণ, সঙ্কীর্ণহৃদয় হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেক তেজস্বী মহাত্মা দেহপ্রাপ্ত হইয়া এই বিষম বিপৎকালে জাতিকে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিভার উপযুক্ত কর্ম্ম না করিয়া কেবল জাতির ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য ও বিশাল কর্ম্মের ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই পুণ্যবলে নব উষার

কিরণমালা চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছে। ভারতজননীর নূতন সন্ততি পিতামাতার গুণপ্রাপ্ত না হইয়া সাহসী, তেজস্বী, উচ্চাশয়, উদার, স্বার্থত্যাগী, পরার্থে ও দেশহিত-সাধনে উৎসাহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হইয়াছে। এইজন্য আজকাল পিতামাতার বশ না হইয়া যুবকগণ স্বপথে পথিক হইতেছে, বৃদ্ধে-তরুণে মতের অনৈক্য ও কার্য্যকালে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। বৃদ্ধগণ এই দেবাংশসম্ভূত তরুণ সত্যযুগ-প্রবর্ত্তকগণকে স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতার সীমায় আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছেন, না বুঝিয়া কলির সাহায্য করিতেছেন। যুবকগণ মহাশক্তিসৃষ্ট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িতে উদ্যত, তাঁহারা পিতৃভক্তি ও বাধ্যতা রক্ষা করিতে অক্ষম। এই অনর্থের উপশম ভগবানই করিতে পারেন। তবে মহাশক্তির ইচ্ছা বিফল হইতে পারে না, এই নবীন সন্ততি যাহা করিতে আসিয়াছেন, তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া যাইবেন না। এই নূতনের মধ্যেও পুরাতনের প্রভাব আছে। অপকৃষ্ট Heredityর দোষে, আসুরিক শিক্ষার দোষে অনেক কুলাঙ্গারও জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; যাঁহারা নবযুগ প্রবর্ত্তনে আদিষ্ট তাঁহারাও অন্তর্নিহিত তেজ ও শক্তি বিকাশ করিতে পারিতেছেন না। নবীনদিগের মধ্যে সত্যযুগ প্রকাশের একটি অপূর্ব্ব লক্ষণ, ধর্ম্মে মতি ও অনেকের হৃদয়ে যোগলিপ্সা ও অর্দ্ধ-বিকশিত যোগশক্তি।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত অশোক নন্দী শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে একজন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন তাঁহারা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না যে, ইনি কোনও

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি অল্প ও অবিশ্বাসযোগ্য প্রমাণে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি অন্য যুবকগণের ন্যায় প্রবল দেশসেবার আকাঙ্ক্ষায় অভিভূত হন নাই। বুদ্ধিতে, চরিত্রে, প্রাণে তিনি সম্পূর্ণ যোগী ও ভক্ত, সংসারীর গুণ তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাহার পিতামহ সিদ্ধ তান্ত্রিক যোগী ছিলেন, তাঁহার পিতাও যোগপ্রাপ্ত শক্তি বিশিষ্ট পুরুষ। গীতায় যে যোগীকুলে জন্ম মানুষের পক্ষে অতি দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। অল্পবয়সে তাঁহার অন্তর্নিহিত যোগশক্তির লক্ষণ এক-একবার প্রকাশ পাইয়াছে। ধৃত হইবার বহু পূর্ব্বে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার যৌবনকালে মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট, অতএব বিদ্যালাভে ও সাংসারিকজীবনের পূর্ব্ব আয়োজনে তাঁহার মন বসে নাই, তথাপি পিতার পরামর্শে পূর্ব্বজ্ঞাত এ সিদ্ধি উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া তাহাই করিতেছিলেন এবং যোগপথেও আরূঢ় হইয়াছিলেন। এমন সময়ে তিনি অকস্মাৎ ধৃত হইলেন। এই কর্ম্মফলপ্রাপ্ত বিপদে বিচলিত না হইয়া অশোক জেলে যোগাভ্যাসে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এই মোকদ্দমায় আসামীদের মধ্যে অনেকে এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য না হইলেও অন্যতম ছিলেন। তিনি ভক্তি ও প্রেমে কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। তাঁহার উদার চরিত্র, গম্ভীর ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ হৃদয় সকলের পক্ষে মুগ্ধকর ছিল। গোঁসাইএর হত্যার সময়ে তিনি হাঁসপাতালে রুগ্ন অবস্থায় ছিলেন। সম্পূর্ণ

স্বাস্থ্যলাভের পূর্ব্বেই নির্জ্জন কারাবাসে রক্ষিত হইয়া তিনি বার বার জ্বরভোগ করিতে লাগিলেন। সেই জ্বরাবস্থাতেই মুক্তকক্ষে হিমে রাত্রি যাপন করিতে হইত। ইহাতে ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই অবস্থায়, যখন প্রাণরক্ষার আর আশা নাই, তখন বিষম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি আবার সেই মৃত্যু-আগারে রক্ষিত ছিলেন। ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশের আবেদনে তাঁহাকে হাঁসপাতালে লইবার ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু জামিনে মুক্তিদান করা হইল না। শেষে ছোটলাটের সহৃদয়তায় তিনি স্বগৃহে স্বজনের সেবা পাইয়া মরিবার অনুমতি পাইলেন। আপীলে মুক্ত হইবার পূর্ব্বেই ভগবান তাঁহাকে দেহকারাবাস হইতে মুক্তি দিলেন। শেষকালে অশোকের যোগশক্তি বিলক্ষণ বৃদ্ধি পায়, মৃত্যুর দিন বিষ্ণুশক্তিতে অভিভূত হইয়া সকলকে ভগবানের মুক্তিদায়ক নাম ও উপদেশ বিতরণ করিয়া নামোচ্চারণ করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুঃখফল ক্ষয় করিতে অশোক নন্দীর জন্ম হইয়াছিল, সেইজন্য এই অনর্থক কষ্ট ও অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে। সত্যযুগ প্রবর্ত্তনে যে-শক্তির প্রয়োজন সেই শক্তি তাহার শরীরে অবতীর্ণ হয় নাই, কিন্তু তিনি স্বাভাবিক যোগশক্তি প্রকাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। কর্ম্মের গতি এইরূপই হয়। পুণ্যবান পাপফল ক্ষয় করিতে অল্পকাল পৃথিবীতে বিচরণ করেন, পরে পাপমুক্ত হইয়া দুষ্টদেহ ত্যাগ ও অন্যদেহ গ্রহণপূর্ব্বক অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ ও জীবের হিতসম্পাদন করিতে আসেন।

জাতীয় উত্থান

আমাদের প্রতিপক্ষীয় ইংরাজগণ বর্ত্তমান মহৎ ও সর্ব্বব্যাপী আন্দোলনকে আরম্ভাবধি বিদ্বেষজাত বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের অনুকরণপ্রিয় কয়েকজন ভারতবাসীও এই মতের পুনরাবৃত্তি করিতে ত্রুটি করেন না। আমরা ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত, জাতীয় উত্থানস্বরূপ আন্দোলন ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাহাতে শক্তিব্যয় করিতেছি। এই আন্দোলন যদি বিদ্বেষজাত হয়, তাহা হইলে আমরা ইহা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া কখনও প্রচার করিতে সাহসী হইতাম না। বিরোধ, যুদ্ধ, হত্যা পর্য্যন্ত ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে; কিন্তু বিদ্বেষ ও ঘৃণা ধর্ম্মের বহির্ভূত; বিদ্বেষ ও ঘৃণা জগতের ক্রমোন্নতির বিকাশে বর্জ্জনীয় হয়, অতএব যাঁহারা স্বয়ং এই বৃত্তিগুলি পোষণ করেন কিম্বা জাতির মধ্যে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা অজ্ঞানের মোহে পতিত হইয়া পাপকে আশ্রয় দেন। এই আন্দোলনের মধ্যে কখনও যে বিদ্বেষ প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন এক পক্ষ বিদ্বেষ ও ঘৃণা করে, তখন অপর পক্ষেও তাহার প্রতিঘাতস্বরূপ বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রসূত হওয়া

অনিবার্য্য। এইরূপ পাপসৃষ্টির জন্য বঙ্গদেশের কয়েকটি ইংরাজ সংবাদ-পত্র ও উদ্ধত-স্বভাব অত্যাচারী ব্যক্তিবিশেষের আচরণ দায়ী। সংবাদপত্রে প্রতিদিন উপেক্ষা, ঘৃণা ও বিদ্বেষসূচক তিরস্কার এবং রেলে, রাস্তায়, হাটে, ঘাটে গালাগালি অপমান ও প্রহার পর্য্যন্ত অনেকদিন সহ্য করিয়া শেষে এই উপদ্রব-সহিষ্ণু ও ধীরপ্রকৃতি ভারতবাসীরও অসহ্য হয় এবং গালির বদলে গালি ও প্রহারের বদলে প্রহারের প্রতিদান আরম্ভ হয়। অনেক ইংরাজও তাঁহাদের দেশভাইদের এই দোষ ও অশুভদৃষ্টির দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উপরন্তু রাজপুরুষগণ দারুণ ভ্রমবশতঃ অনেক দিন হইতে প্রজার স্বার্থবিরোধী, অসন্তোষজনক ও মর্ম্মবেদনাদায়ক কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। মানুষের স্বভাব ক্রোধপ্রবণ, স্বার্থে আঘাত পড়ায়, অপ্রিয় আচরণে কিম্বা প্রাণের প্রিয় বস্তু বা ভাবের উপর দৌরাত্ম্য করায় সেই সর্ব্বপ্রাণী-নিহিত ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠে, ক্রোধের আতিশয্যে ও অন্ধগতিতে বিদ্বেষ ও বিদ্বেষ-জাত আচরণও উৎপন্ন হয়। ভারতবাসীর প্রাণে বহুকাল হইতে ইংরাজ ব্যক্তিবিশেষের অন্যায় আচরণে ও উদ্ধত কথায় এবং বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে প্রজার কোনও প্রকৃত অধিকার বা ক্ষমতা না থাকায় ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। শেষে লর্ড কর্জ্জনের শাসন-সময়ে এই অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করিয়া বঙ্গভঙ্গজাত অসহ্য মর্ম্মবেদনায় অসাধারণ ক্রোধ দেশময় জ্বলিয়া উঠিয়া রাজপুরুষদিগের নিগ্রহ-নীতির ফলে বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। ইহাও স্বীকার করি যে, অনেকে ক্রোধে

অধীর হইয়া সেই বিদ্বেষাগ্নিতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃতাহুতি দিয়াছেন। ভগবানের লীলা অতি বিচিত্র, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্বে জগতের ক্রমোন্নতি পরিচালিত অথচ অশুভ প্রায়ই শুভের সহায়তা করে, ভগবানের অভীপ্সিত মঙ্গলময় ফল উৎপাদন করে। এই পরম অশুভ যে বিদ্বেষ সৃষ্টি, তাহারও এই শুভ ফল হইল যে, তমঃ অভিভূত ভারতবাসীর মধ্যে রাজসিক শক্তি জাগরণের উপযোগী উৎকট রাজসিক প্রেরণা উৎপন্ন হইল। তাই বলিয়া আমরা অশুভের বা অশুভ-কারীর প্রশংসা করিতে পারি না। যিনি রাজসিক অহঙ্কারের বশে অশুভ কার্য্য করেন, তাঁহার কার্য্য দ্বারা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট শুভ ফলের সহায়তা হয় বলিয়া তাঁহার দায়িত্ব ও ফলভোগরূপ বন্ধন কিছুমাত্র ঘুচে না। যাঁহারা জাতিগত বিদ্বেষ প্রচার করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত; বিদ্বেষ-প্রচারে যে ফল হয়, নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম-প্রচারে তাহার দশগুণ ফল হয় এবং তাহাতে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মজাত পাপফল ভোগ না হইয়া ধর্ম্ম বৃদ্ধি ও অমিশ্র পুণ্যের সৃষ্টি হয়। আমরা জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণাজনক কথা লিখিব না, অপরকেও সেইরূপ অনর্থ-সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিব। জাতিতে জাতিতে স্বার্থবিরোধ উৎপন্ন হইলে, বা বর্ত্তমান অবস্থার অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ হইলে, আমরা পরজাতির স্বার্থনাশে ও স্বজাতি-স্বার্থসাধনে আইনে ও ধর্ম্মনীতিতে অধিকারী। অত্যাচার বা অন্যায় কার্য্য ঘটিলে আমরা তাহার তীব্র উল্লেখে এবং জাতীয় শক্তির সংঘাত ও সর্ব্ববিধ বৈধ উপায় ও বৈধ প্রতি-

রোধ দ্বারা তাহার অপনোদনে আইনে ও ধর্ম্মনীতিতে অধিকারী। কোনও ব্যক্তিবিশেষ, তিনি রাজপুরুষই হউন বা দেশবাসীই হউন, অমঙ্গলজনক অন্যায় ও অযৌক্তিক কার্য্য বা মত প্রকাশ করিলে আমরা ভদ্রসমাজোচিত আচারের অবিরোধী বিদ্রূপ ও তিরস্কার করিয়া সেই কার্য্য বা সেই মতের প্রতিবাদ ও খণ্ডনে অধিকারী। কিন্তু কোনও জাতি বা ব্যক্তির উপর বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ বা সৃজনে আমরা অধিকারী নহি। অতীতে যদি এইরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে, সে অতীতের কথা; ভবিষ্যতে যাহাতে এই দোষ না ঘটে আমরা সকলকে এবং বিশেষতঃ জাতীয় পক্ষের সংবাদপত্র ও কার্য্যক্ষম যুবকবৃন্দকে এই উপদেশ দিতেছি।

আর্য্যজ্ঞান, আর্য্যশিক্ষা, আর্য্য-আদর্শ, জড়জ্ঞানবাদী রাজসিক ভোগপরায়ণ পাশ্চাত্য জাতির জ্ঞান, শিক্ষা ও আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। য়ূরোপীয়দের মতে স্বার্থ ও সুখান্বেষণের অভাবে কর্ম্ম অনাচরণীয়, বিদ্বেষের অভাবে বিরোধ ও যুদ্ধ অসম্ভব। হয় সকাম কর্ম্ম করিতে হয়, নচেৎ কামনাহীন সন্ন্যাসী হইয়া বসিতে হয়, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। জীবিকার্থ সংঘর্ষে জগৎ গঠিত, জগতের ক্রমোন্নতি সাধিত, ইহাই তাঁহাদের বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। আর্য্যগণ যেদিন উত্তরমেরু হইতে দক্ষিণে যাত্রা করিয়া পঞ্চনদভূমি অধিকার করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে এই সনাতন শিক্ষা লাভ করিয়া জগতে সনাতন প্রতিষ্ঠা লাভও করিয়াছেন যে, এই বিশ্ব আনন্দধাম, প্রেম, সত্য ও শক্তি বিকাশের জন্য

সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ স্থাবর জঙ্গমে, মনুষ্য পশু কীট পতঙ্গে, সাধু পাপীতে, শত্রু মিত্রে, দেব অসুরে প্রকাশ হইয়া জগৎময় ক্রীড়া করিতেছেন। ক্রীড়ার জন্য সুখ, ক্রীড়ার জন্য দুঃখ, ক্রীড়ার জন্য পাপ, ক্রীড়ার জন্য পুণ্য, ক্রীড়ার জন্য বন্ধুত্ব, ক্রীড়ার জন্য শত্রুতা, ক্রীড়ার জন্য দেবত্ব, ক্রীড়ার জন্য অসুরত্ব। মিত্র শত্রু সকলই ক্রীড়ার সহচর, দুই পক্ষে বিভক্ত হইয়া স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সৃষ্টি করিয়াছে। আর্য্য মিত্রকে রক্ষা করেন, শত্রুকে দমন করেন, কিন্তু তাঁহার আসক্তি নাই। তিনি সর্ব্বত্র, সর্ব্বভূতে, সর্ব্ব বস্তুতে, সর্ব্ব কর্ম্মে, সর্ব্ব ফলে নারায়ণকে দর্শন করিয়া ইষ্টানিষ্টে, শত্রুমিত্রে, সুখদুঃখে, পাপপুণ্যে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন। ইহার এই অর্থ নহে যে সর্ব্ব পরিণাম তাঁহার ইষ্ট, সর্ব্ব জন তাঁহার মিত্র, সর্ব্ব ঘটনা তাঁহার সুখদায়ক, সর্ব্ব কর্ম্ম তাঁহার আচরণীয়, সর্ব্ব ফল তাঁহার বাঞ্ছনীয়। সম্পূর্ণ যোগপ্রাপ্তি না হইলে দ্বন্দ্ব ঘুচে না, সেই অবস্থা অল্পজনপ্রাপ্য, কিন্তু আর্য্যশিক্ষা সাধারণ আর্য্যের সম্পত্তি। আর্য্য ইষ্টসাধনে ও অনিষ্টবর্জ্জনে সচেষ্ট হয়েন কিন্তু ইষ্টলাভে জয়মদে মত্ত হন না, অনিষ্টসম্পাদনে ভীত হন না। মিত্রের সাহায্য, শত্রুর পরাজয় তাঁহার চেষ্টার উদ্দেশ্য হয়, কিন্তু তিনি শত্রুকে বিদ্বেষ ও মিত্রকে অন্যায় পক্ষপাত করেন না, কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বজন-সংহারও করিতে পারেন, বিপক্ষের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। সুখ তাঁহার প্রিয়, দুঃখ তাঁহার অপ্রিয় হয়, কিন্তু তিনি সুখে অধীর হন না, দুঃখেও তাঁহার ধৈর্য্য ও প্রীতভাব অবিচলিত

হইয়া থাকে। তিনি পাপবর্জ্জন ও পুণ্যসঞ্চয় করেন, কিন্তু পুণ্যকর্ম্মে গর্ব্বিত হয়েন না, পাপে পতিত হইলে দুর্ব্বল বালকের ন্যায় ক্রন্দন করেন না, হাসিতে হাসিতে পঙ্ক হইতে উঠিয়া কর্দ্দমাক্ত শরীরকে মুছিয়া পরিষ্কার ও শুদ্ধ করিয়া পুনরায় আত্মোন্নতিতে সচেষ্ট হয়েন। আর্য্য কর্ম্মসিদ্ধির জন্য বিপুল প্রয়াস করেন, সহস্র পরাজয়েও বিরত হন না, কিন্তু অসিদ্ধিতে দুঃখিত, বিমর্ষ বা বিরক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে অধর্ম্ম। অবশ্য যখন কেহ যোগারূঢ় হইয়া গুণাতীত ভাবে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার পক্ষে দ্বন্দ্ব শেষ হইয়াছে, জগন্মাতা যে কার্য্য দেন, তিনি বিনাবিচারে তাহাই করেন, যে ফল দেন, সানন্দে তাহা ভোগ করেন, স্বপক্ষ বলিয়া যাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট করেন, তাঁহাকে লইয়া মায়ের কার্য্য সাধন করেন, বিপক্ষ বলিয়া যাঁহাকে দেখান, তাঁহাকে আদেশমত দমন বা সংহার করেন। এই শিক্ষাই আর্য্যশিক্ষা। এই শিক্ষার মধ্যে বিদ্বেষ বা ঘৃণার স্থান নাই। নারায়ণ সর্ব্বত্র। কাহাকে বিদ্বেষ করিব, কাহাকে ঘৃণা করিব? আমরা যদি পাশ্চাত্য ভাবে রাজনীতিক আন্দোলন করি, তাহা হইলে বিদ্বেষ ও ঘৃণা অনিবার্য্য হয় এবং পাশ্চাত্য মতে নিন্দনীয় নহে, কেননা স্বার্থের বিরোধ আছে, একপক্ষে উত্থান, অন্যপক্ষে দমন চলিতেছে। কিন্তু আমাদের উত্থান কেবল আর্য্যজাতির উত্থান নহে, আর্য্যচরিত্র, আর্য্যশিক্ষা, আর্য্যধর্ম্মের উত্থান। আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রভাব বড় প্রবল ছিল, তথাপি প্রথম অবস্থায়ও এই সত্য উপলব্ধ হইয়াছে;

মাতৃপূজা, মাতৃপ্রেম, আর্য্য অভিমানের তীব্র অনুভবে ধর্ম্ম-প্রধান দ্বিতীয় অবস্থা প্রস্তুত হইয়াছে। রাজনীতি ধর্ম্মের অঙ্গ, কিন্তু তাহা আর্য্যভাবে, আর্য্যধর্ম্মের অনুমোদিত উপায়ে আচরণ করিতে হয়। আমরা ভবিষ্যৎ আশাস্বরূপ যুবকদিগকে বলি, যদি তোমাদের প্রাণে বিদ্বেষ থাকে, তাহা অচিরে উন্মূলিত কর। বিদ্বেষের তীব্র উত্তেজনায় ক্ষণিক রজঃপূর্ণ বল সহজে জাগ্রত হয় ও শীঘ্র ভাঙ্গিয়া দুর্ব্বলতায় পরিণত হয়। যাঁহারা দেশোদ্ধারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, তাঁহাদের মধ্যে প্রবল ভ্রাতৃভাব, কঠোর উদ্যম, লৌহসম দৃঢ়তা ও জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য তেজ সঞ্চার কর, সেই শক্তিতে আমরা অটুটবলান্বিত ও চিরজয়ী হইব।

অতীতের সমস্যা

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় শতবর্ষ কাল পাশ্চাত্য ভাবের সম্পূর্ণ আধিপত্যে ভারতবাসী আর্য্যজ্ঞানে ও আর্য্যভাবে বঞ্চিত হইয়া শক্তিহীন, পরাশ্রয়প্রবণ ও অনুকরণপ্রিয় হইয়া রহিয়াছিল। এই তামসিক ভাব এখন অপনোদিত হইতেছে। কেন ইহার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা একবার মীমাংসা করা আবশ্যক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তামসিক অজ্ঞান ও ঘোর রাজসিক প্রবৃত্তি ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়াছিল, দেশে সহস্র স্বার্থপর, কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ, দেশদ্রোহী, শক্তিমান অসুরপ্রকৃতি লোক জন্মগ্রহণ করিয়া পরাধীনতার অনুকূল অবস্থা প্রস্তুত করিয়াছিল। সেই সময়ে ভগবানের গূঢ় অভিসন্ধি সম্পাদনার্থ ভারতে দূর দ্বীপান্তরবাসী ইংরাজ বণিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। পাপ-ভারার্ত্ত ভারতবর্ষ অনায়াসে বিদেশীর করতলগত হইল। এই অদ্ভুত কাণ্ড ভাবিয়া এখনও জগৎ আশ্চর্য্যান্বিত। ইহার কোনও সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে না পারিয়া সকলেই ইংরাজ জাতির গুণের অশেষ প্রশংসা করিতেছে। ইংরাজ জাতির অনেক গুণ আছে; না থাকিলে তাঁহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী জাতি

হইতে পারিতেন না। কিন্তু যাঁহারা বলেন ভারতবাসীর নিকৃষ্টতা, ইংরাজের শ্রেষ্ঠতা, ভারতবাসীর পাপ, ইংরাজের পুণ্য এই অদ্ভুত ঘটনার একমাত্র কারণ তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত না হইয়াও লোকের মনে কয়েকটি ভ্রান্তধারণা উৎপাদন করিয়াছেন। অতএব এই বিষয়ের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানপূর্ব্বক নির্ভুল মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা যাউক। অতীতের সূক্ষ্ম সন্ধানের অভাবে ভবিষ্যতের গতি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

ইংরাজের ভারত-বিজয় জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় ঘটনা। এই বৃহৎ দেশ যদি অসভ্য, দুর্ব্বল বা নির্ব্বোধ ও অক্ষম জাতির বাসস্থান হইত, তাহা হইলে এইরূপ কথা বলা যাইত না। কিন্তু ভারতবর্ষ রাজপুত, মারাঠা, শিখ, পাঠান, মোগল প্রভৃতির বাসভূমি; তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাঙ্গালী, চিন্তাশীল মান্দ্রাজী, রাজনীতিজ্ঞ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ভারতজননীর সন্তান। ইংরাজের বিজয়ের সময়ে নানা ফড়নবীসের ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্, মাধোজী সিন্ধিয়ার ন্যায় যুদ্ধ-বিশারদ সেনাপতি, হায়দর আলি ও রঞ্জিত সিংহের ন্যায় তেজস্বী ও প্রতিভাশালী রাজ্য-নির্ম্মাতা প্রদেশে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবাসী তেজে, শৌর্য্যে বুদ্ধিতে কোনও জাতির অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত সরস্বতীর মন্দির, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, শক্তির ক্রীড়াস্থান ছিল। অথচ যে-দেশ প্রবল ও বৰ্দ্ধনশীল মুসলমান শত শত বর্ষব্যাপী প্রয়াসে অতিকষ্টে জয় করিয়া কখনও নির্ব্বিঘ্নে শাসন করিতে পারেন নাই, সেই দেশ পঞ্চাশ বৎসরের

মধ্যে অনায়াসে মুষ্টিমেয় ইংরাজ বণিকের আধিপত্য স্বীকার করিল, শতবৎসরের মধ্যে তাঁহাদের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের ছায়ায় নিশ্চেষ্টভাবে নিদ্রিত হইয়া পড়িল! বলিবে একতার অভাব এই পরিণামের কারণ। স্বীকার করিলাম, একতার অভাব আমাদের দুর্গতির একটি প্রধান কারণ বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে কোনও কালেও একতা ছিল না। মহাভারতের সময়েও একতা ছিল না, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের সময়েও ছিল না, মুসলমানের ভারতবিজয়কালেও ছিল না, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ছিল না। একতার অভাব এই অদ্ভুত ঘটনার একমাত্র কারণ হইতে পারে না। যদি বল, ইংরাজদিগের পুণ্য ইহার কারণ, জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা সেই সময়ের ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারা কি বলিতে সাহসী হইবেন যে, সেইকালের ইংরাজ বণিক সেইকালের ভারতবাসীর অপেক্ষা গুণে ও পুণ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন? যে ক্লাইভ ও ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ প্রমুখ ইংরাজ বণিক ও দস্যুগণ ভারতভূমি জয় ও লুণ্ঠন করিয়া জগতে অতুলনীয় সাহস, উদ্যম ও আত্মম্ভরিতা এবং জগতে অতুলনীয় দুর্গুণেরও দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, শক্তিমান অসুর-গণের পুণ্যের কথা শ্রবণ করিলে হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর। সাহস, উদ্যম ও আত্মম্ভরিতা অসুরের গুণ, অসুরের পুণ্য, সেই পুণ্য ক্লাইভ প্রভৃতি ইংরাজগণের ছিল। কিন্তু তাহাদের পাপ ভারত-বাসীর পাপ অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন ছিল না। অতএব ইংরাজের পুণ্যে এই অঘটন ঘটন হয় নাই।

ইংরাজও অসুর ছিলেন, ভারতবাসীও অসুর ছিলেন, তখন দেবে অসুরে যুদ্ধ হয় নাই, অসুরে অসুরে যুদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্য অসুরে এমন কি মহৎ গুণ ছিল যাহার প্রভাবে তাঁহাদের তেজ, শৌর্য্য ও বুদ্ধি সফল হইল, ভারতবাসী অসুরে এমন কি সাংঘাতিক দোষ ছিল যাহার প্রভাবে তাঁহাদের তেজ, শৌর্য্য ও বুদ্ধি বিফল হইল ? প্রথম উত্তর এই, ভারতবাসী আর-সকল গুণে ইংরাজের সমান হইয়াও জাতীয়ভাবরহিত ছিলেন, ইংরাজের মধ্যে সেই গুণের পূর্ণ বিকাশ ছিল ; এই কথায় যেন কেহ না বুঝেন যে, ইংরাজগণ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণায় ভারতে বিপুল সাম্রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়ভাব স্বতন্ত্র বৃত্তি। স্বদেশ-প্রেমিক স্বদেশের সেবাভাবে উন্মত্ত, সর্ব্বত্র স্বদেশকে দেখেন, সকল কার্য্য স্বদেশকে ইষ্টদেবতা বলিয়া যজ্ঞরূপে সমর্পণ করিয়া দেশের হিতের জন্যই করেন, দেশের স্বার্থে আপনার স্বার্থ ডুবাইয়া দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজগণের সেই ভাব ছিল না ; সেই ভাব কোন জড়বাদী পাশ্চাত্য জাতির প্রাণে স্থায়ীরূপে থাকিতে পারে না। ইংরাজগণ স্বদেশের হিতার্থে ভারতে আসেন নাই, স্বদেশের হিতার্থে ভারত-বিজয় করেন নাই, তাঁহারা বানিজ্যার্থ, নিজ নিজ আর্থিক লাভার্থ আসিয়াছিলেন ; স্বদেশের হিতার্থে ভারত-বিজয় ও লুণ্ঠন করেন নাই, অনেকটা নিজ স্বার্থ সিদ্ধ্যার্থে জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক না হইয়াও তাঁহারা জাতীয়ভাবাপন্ন ছিলেন। আমার দেশ শ্রেষ্ঠ,

আমার জাতির আচার, বিচার, ধর্ম্ম, চরিত্র, নীতি, বল, বিক্রম, বুদ্ধি, মত, কর্ম্ম উৎকৃষ্ট, অতুল্য এবং অন্য জাতির পক্ষে দুর্লভ—এই অভিমান; আমার দেশের হিতে আমার হিত, আমার দেশের গৌরবে আমার গৌরব, আমার দেশ-ভাইয়ের বৃদ্ধিতে আমি বর্দ্ধিত—এই বিশ্বাস; কেবল আমার স্বার্থসাধন না করিয়া তাহার সহিত দেশের স্বার্থ সম্পাদন করিব, দেশের মান, গৌরব ও বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্ত্তব্য, আবশ্যক হইলে সেই যুদ্ধে নির্ভয়ে প্রাণবিসর্জ্জন করা বীরের ধর্ম্ম, এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাতীয় ভাবের প্রধান লক্ষণ। জাতীয় ভাব রাজসিক ভাব; স্বদেশপ্রেম সাত্ত্বিক। যিনি নিজের "অহং" দেশের "অহং"এ বিলীন করিতে পারেন, তিনি আদর্শ স্বদেশ-প্রেমিক, যিনি নিজের "অহং" সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া তাহার দ্বারা দেশের "অহং" বর্দ্ধিত করেন, তিনি জাতীয়ভাবাপন্ন। সেই কালের ভারতবাসীরা জাতীয়ভাবশূন্য ছিলেন। তাঁহারা যে কখনও জাতির হিত দেখিতেন না, এমন কথা বলি না, কিন্তু জাতির ও আপনার হিতের মধ্যে লেশমাত্র বিরোধ থাকিলে প্রায়ই জাতির হিত বর্জ্জন করিয়া নিজ হিত সম্পাদন করিতেন। একতার অভাব অপেক্ষা এই জাতীয়তার অভাব আমাদের মতে মারাত্মক দোষ। পূর্ণ জাতীয় ভাব দেশময় ব্যাপ্ত হইলে এই নানা ভেদসঙ্কুল দেশেও একতা সম্ভব; কেবল একতা চাই, একতা চাই বলিলে একতা সাধিত হয় না; ইহাই ইংরাজের ভারত-বিজয়ের প্রধান কারণ। অসুরে অসুরে সংঘর্ষ হইল,

জাতীয়ভাবাপন্ন একতাপ্রাপ্ত অসুরগণ জাতীয়ভাবশূন্য একতাশূন্য সমানগুণবিশিষ্ট অসুরগণকে পরাজিত করিলেন। বিধাতার এই নিয়ম, যিনি দক্ষ ও শক্তিমান তিনিই কুস্তিতে জয়ী হয়েন ; যিনি ক্ষিপ্রগতি ও সহিষ্ণু তিনিই দৌড়ে প্রথম গন্তব্যস্থানে পৌঁছেন। সচ্চরিত্র বা পুণ্যবান বলিয়া কেহ দৌড়ে বা কুস্তিতে জয়ী হন নাই, উপযুক্ত শক্তি আবশ্যক। তেমনই জাতীয়ভাবের বিকাশে দুর্ব্বৃত্ত ও আসুরিক জাতিও সাম্রাজ্য-স্থাপনে সক্ষম হয়, জাতীয়ভাবের অভাবে সচ্চরিত্র ও গুণসম্পন্ন জাতিও পরাধীন হইয়া শেষে চরিত্র ও গুণ হারাইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

রাজনীতির দিক দেখিলে ইহাই ভারত-বিজয়ের শ্রেষ্ঠ মীমাংসা ; কিন্তু ইহার মধ্যে আরও গভীর সত্য নিহিত আছে। বলিয়াছি, তামসিক অজ্ঞান ও রাজসিক প্রবৃত্তি ভারতে অতি প্রবল হইয়াছিল। এই অবস্থা পতনের অগ্রগামী অবস্থা। রজোগুণসেবায় রাজসিক শক্তির বিকাশ হয় ; কিন্তু অমিশ্র রজঃ শীঘ্র তমোমুখী হয়, উদ্ধত শৃঙ্খলাবিহীন রাজসিক চেষ্টা অতি শীঘ্র অবসন্ন ও শ্রান্ত হইয়া অপ্রবৃত্তি, শক্তিহীনতা, বিষাদ ও নিশ্চেষ্টতায় পরিণত হয়। সত্ত্বমুখী হইলেই রজঃশক্তি স্থায়ী হয়। সাত্ত্বিক ভাব যদিও না থাকে, সাত্ত্বিক আদর্শ আবশ্যক ; সেই আদর্শ দ্বারা রজঃশক্তি শৃঙ্খলিত ও স্থায়ী-বলপ্রাপ্ত হয়। স্বাধীনতা ও সুশৃঙ্খলতা ইংরাজের এই দুই মহান সাত্ত্বিক আদর্শ চিরকাল ছিল, তাহার বলে ইংরাজ জগতে প্রধান ও চিরজয়ী। উনবিংশ

শতাব্দীতে পরোপকার লিপ্সাও জাতির মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল, তাহার বলে ইংলণ্ড জাতীয় মহত্ত্বের চরমাবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। উপরন্তু য়ূরোপে যে জ্ঞানতৃষ্ণার প্রবল প্রেরণায় পাশ্চাত্য জাতি শত শত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন, কণামাত্র জ্ঞানলাভের জন্য শত শত লোক প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হন, সেই বলীয়সী সাত্ত্বিক জ্ঞানতৃষ্ণা ইংরাজ জাতির মধ্যে বিকশিত ছিল। এই সাত্ত্বিক শক্তিতে ইংরাজ বলবান ছিলেন, এই সাত্ত্বিক শক্তি ক্ষীণ হইতেছে বলিয়া ইংরাজের প্রাধান্য, তেজ ও বিক্রম ক্ষীণ হইয়া ভয়, বিষাদ ও আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতেছে। সাত্ত্বিক লক্ষ্যভ্রষ্ট রজঃশক্তি তমোমুখী হইতেছে। অপরপক্ষে ভারতবাসীগণ মহান সাত্ত্বিক জাতি ছিলেন; সেই সাত্ত্বিক বলে জ্ঞানে, শৌর্য্যে, তেজে, বলে তাঁহারা অতুলনীয় হইয়াছিলেন এবং একতাবিহীন হইয়াও সহস্র বর্ষকাল ধরিয়া বিদেশীর আক্রমণের প্রতিরোধ ও দমনে সমর্থ ছিলেন। শেষে রজোবৃদ্ধি ও সত্ত্বের হ্রাস হইতে লাগিল। মুসলমানের আগমন-কালে জ্ঞানের বিস্তার সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তখন রজঃপ্রধান রাজপুতজাতি ভারতের সিংহাসনে অধিরূঢ়; উত্তর ভারতে যুদ্ধ বিগ্রহ আত্মকলহের প্রাধান্য, বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিতে তামসিকভাব প্রবল। অধ্যাত্মজ্ঞান দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় লইয়াছিল; সেই সত্ত্ববলে দক্ষিণ ভারত অনেকদিন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। জ্ঞানতৃষ্ণা এবং জ্ঞানের উন্নতি বন্ধ হইতে চলিল, তাহার স্থানে পাণ্ডিত্যের মান

ও গৌরব বৰ্দ্ধিত হইল, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যোগশক্তি বিকাশ ও আভ্যন্তরিক উপলব্ধির স্থানে তামসিক পূজা ও সকাম রাজসিক ব্রতোদযাপনের বাহুল্য হইতে লাগিল, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লুপ্ত হইলে লোকে বাহ্যিক আচার ও ক্রিয়া অধিক মূল্যবান ভাবিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ জাতিধর্ম্ম লোপেই গ্রীস, রোম, মিসর, আসিরিয়ার মৃত্যু হইয়াছিল; কিন্তু সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যজাতির মধ্যে সেই সনাতন উৎস হইতে মধ্যে মধ্যে সঞ্জীবনী সুধাধারা নির্গত হইয়া জাতির প্রাণরক্ষা করিত। শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, নানক, রামদাস, তুকারাম সেই অমৃতসিঞ্চন করিয়া মরণাহত ভারতে প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। অথচ রজঃ ও তমঃ স্রোতের এমন বল ছিল যে সেই টানে উত্তমও অধমে পরিণত হইল; সাধারণ লোকে শঙ্করদত্ত জ্ঞান দ্বারা তামসিক ভাবের সমর্থন করিতে লাগিল, চৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম ঘোর তামসিক নিশ্চেষ্টতার আশ্রয়ে পরিণত হইল, রামদাসের শিক্ষাপ্রাপ্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ মহারাষ্ট্রধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া স্বার্থসাধনে ও আত্মকলহে শক্তির অপব্যবহার করিয়া শিবাজী ও বাজীরাওয়ের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য বিনষ্ট করিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই স্রোতের পূর্ণ বেগ দেখা গেল। সমাজ ও ধর্ম্ম তখন কয়েকজন আধুনিক বিধানকর্ত্তার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ, বাহ্যিক আচার ও ক্রিয়ার আড়ম্বর ধর্ম্ম নামে অভিহিত, আর্য্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়, আর্য্যচরিত্র বিনষ্টপ্রায়, সনাতন ধর্ম্ম সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর অরণ্যবাসে ও ভক্তের হৃদয়ে লুকাইয়া রহিল। ভারত তখন ঘোর তমঃ-

অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অথচ প্রচণ্ড রাজসিক প্রবৃত্তি বাহ্যিক ধর্ম্মের আবরণে স্বার্থ, পাপ, দেশের অকল্যাণ, পরের অনিষ্ট পূর্ণবেগে সাধন করিতেছিল। দেশে শক্তির অভাব ছিল না, কিন্তু আর্য্য-ধর্ম্মলোপে, সত্ত্বলোপে সেই শক্তি আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া আত্মবিনাশ করিল। শেষে ইংরাজের আসুরিক শক্তির নিকট পরাজিত হইয়া ভারতের আসুরিক শক্তি শৃঙ্খলিত ও মুমূর্ষু হইয়া পড়িল। ভারত পূর্ণ তমোভাবের ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, অজ্ঞান, অকর্ম্মণ্যতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, আত্মসম্মানবিসর্জ্জন, দাসত্বপ্রিয়তা, পরধর্ম্মসেবা, পরের অনুকরণ, পরাশ্রয়ে আত্মোন্নতিচেষ্টা, বিষাদ, আত্মনিন্দা, ক্ষুদ্রাশয়তা, আলস্য ইত্যাদি সকলই তমোভাব প্রকাশক গুণ। এই সকলের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে কোনটির অভাব ছিল? সেই শতাব্দীর সর্ব্ব চেষ্টা এই গুণ সকলের প্রাবল্যে তমঃশক্তির চিহ্নে সর্ব্বত্র চিহ্নিত।

ভগবান যখন ভারতকে জাগাইলেন, তখন সেই জাগরণের প্রথম আবেগে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনার জ্বালাময়ী শক্তি জাতির শিরায় শিরায় খরতরবেগে বহিতে লাগিল। তাহার সহিত স্বদেশ-প্রেমের উন্মাদকর আবেগ যুবকবৃন্দকে অভিভূত করিল। আমরা পাশ্চাত্যজাতি নহি, আমরা এসিয়াবাসী, আমরা ভারত-বাসী, আমরা আর্য্য। আমরা জাতীয়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার না হইলে আমাদের জাতীয়-ভাব পরিস্ফুট হয় না। সেই স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি মাতৃপূজা।

যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল, সেইদিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিল, মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশ মাতা, স্বদেশ ভগবান, এই বেদান্ত-শিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা জাতীয় অভ্যুত্থানের বীজস্বরূপ। যেমন জীব ভগবানের অংশ, তাহার শক্তি ভগবানের শক্তির অংশ, তেমনই এই সপ্তকোটী বঙ্গবাসী, এই ত্রিশকোটী ভারতবাসীর সমষ্টি সর্ব্বব্যাপী বাসুদেবের অংশ, এই ত্রিশকোটীর আশ্রয়, শক্তিস্বরূপিণী, বহুভুজান্বিতা, বহুবলধারিণী ভারত-জননী ভগবানের একটি শক্তি, মাতা, দেবী, জগজ্জননী কালীর দেহবিশেষ। এই মাতৃপ্রেম, মাতৃমূর্ত্তি জাতির মনে প্রাণে জাগরিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই কয় বর্ষের উত্তেজনা, উদ্যম, কোলাহল, অপমান, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন ভগবানের বিধানে বিহিত ছিল। সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার পরে কি?

তাহার পরে আর্য্য জাতির সনাতন শক্তির পুনরুদ্ধার। প্রথম আর্য্যচরিত্র ও শিক্ষা, দ্বিতীয় যোগশক্তির পুনর্বিকাশ, তৃতীয় আর্য্যোচিত জ্ঞানতৃষ্ণা ও কর্ম্মশক্তির দ্বারা নবযুগের আবশ্যক সামগ্রী সঞ্চয় এবং এই কয় বর্ষের উন্মাদিনী উত্তেজনা শৃঙ্খলিত ও স্থিরলক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া মাতৃকার্য্যোদ্ধার। এখন যে-সব যুবকবৃন্দ দেশময় পথান্বেষণ ও কর্ম্মান্বেষণ করিতেছেন, তাঁহারা উত্তেজনা অতিক্রম করিয়া কিছুদিন শক্তি আনয়নের পথ খুঁজিয়া লউন। যে মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে

হইবে, তাহা কেবল উত্তেজনার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, শক্তি চাই। তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদের শিক্ষায় যে শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই শক্তি অঘটনঘটনপটীয়সী। সেই শক্তি তোমাদের শরীরে অবতরণ করিতে উদ্যত হইতেছেন। সেই শক্তিই মা। তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবার উপায় শিখিয়া লও। মা তোমাদিগকে যন্ত্র করিয়া এত সত্বর, এমন সবলে কার্য্য সম্পাদন করিবেন যে, জগৎ স্তম্ভিত হইবে। সেই শক্তির অভাবে তোমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইবে। মাতৃমূর্ত্তি তোমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, তোমরা মাতৃপূজা ও মাতৃসেবা করিতে শিখিয়াছ, এখন অন্তর্নিহিত মাতাকে আত্মসমর্পণ কর। কার্য্যোদ্ধারের অন্য পন্থা নাই।

স্বাধীনতার অর্থ

স্বাধীনতা আমাদের রাজনীতিক চেষ্টার উদ্দেশ্য, কিন্তু স্বাধীনতা কি, তাহা লইয়া মতভেদ বর্ত্তমান। অনেকে স্বায়ত্তশাসন বলেন, অনেকে ঔপনিবেশিক স্বরাজ বলেন, অনেকে সম্পূর্ণ স্বরাজ বলেন। আর্য্য ঋষিগণ সম্পূর্ণ ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এবং তৎফলস্বরূপ অক্ষুণ্ণ আনন্দকে স্বারাজ্য বলিতেন। রাজনীতিক স্বাধীনতা স্বারাজ্যের একমাত্র অঙ্গ—তাহার দুইদিক আছে, বাহ্যিক স্বাধীনতা ও আন্তরিক স্বাধীনতা। বিদেশীয় শাসন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি বাহ্যিক স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র আন্তরিক স্বাধীনতার চরম বিকাশ। যতদিন পরের শাসন বা রাজত্ব থাকে, ততদিন কোন জাতিকে স্বরাজপ্রাপ্ত স্বাধীন জাতি বলে না। যতদিন প্রজাতন্ত্র সংস্থাপন না হয়, ততদিন জাতির অন্তর্গত প্রজাকে স্বাধীন মনুষ্য বলে না। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, বিদেশীর আদেশ ও বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, স্বগৃহে প্রজার সম্পূর্ণ আধিপত্য, ইহাই আমাদের রাজনীতিক লক্ষ্য।

এই আকাঙ্ক্ষার কারণ সংক্ষেপে বলিব। জাতির পক্ষে পরাধীনতা মৃত্যুর দূত ও আজ্ঞাবাহক, স্বাধীনতায়ই জীবনরক্ষা,

স্বাধীনতায়ই উন্নতির সম্ভাবনা। স্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাবনিয়ত জাতীয় কর্ম্ম ও চেষ্টা জাতীয় উন্নতির একমাত্র পন্থা। বিদেশী যদি দেশ অধিকার করিয়া অতি দয়ালু ও হিতৈষীও হন, তাহা হইলেও আমাদের মস্তকে পরধর্ম্মের ভার চাপাইতে ছাড়িবেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল হউক মন্দ হউক, তাহাতে আমাদের অহিত ভিন্ন হিত হইবে না। পরের স্বভাবনিয়ত পথে অগ্রসর হইবার শক্তি ও প্রেরণা আমাদের নাই, সেই পথে গেলে আমরা অতি সুন্দর রূপে পরের অনুকরণ করিতে পারি, পরের উন্নতির লক্ষণ ও বেশভূষায় অতি দক্ষতার সহিত স্বীয় অবনতি আচ্ছাদন করিতে পারি, কিন্তু পরীক্ষাকালে আমাদের পরধর্ম্মসেবাসম্ভূত দুর্ব্বলতা ও অসারতা বিকাশ পাইবে। আমরাও সেই অসারতার ফলে বিনাশপ্রাপ্ত হইব। রোমের আধিপত্যভুক্ত, রোমের সভ্যতাপ্রাপ্ত প্রাচীন য়ুরোপীয় জাতিসকল অনেকদিন সুখস্বচ্ছন্দে কাটাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শেষ অবস্থা অতি ভয়ানক হইল, মনুষ্যত্ব বিনাশে তাঁহাদের যে ঘোর দুর্দ্দশা হইল, প্রত্যেক পরাধীনতা-পরায়ণ জাতির সেই মনুষ্যত্ব-বিনাশ ও ঘোর দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী। পরাধীনতার প্রধান ভিত্তি জাতির স্বধর্ম্মনাশ ও পরধর্ম্মসেবা, যদি পরাধীন অবস্থায় স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে বা পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি, পরাধীনতার বন্ধন আপনি খসিয়া পড়িবে, ইহা অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব কোন জাতি যদি নিজদোষে পরাধীনতায় পতিত হয়, অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ তাহার প্রথম উদ্দেশ্য ও রাজনীতিক আদর্শ হওয়া

উচিত। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বরাজ নয়, তবে যদি বিনা সর্ত্তে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয় এবং জাতি আদর্শভ্রষ্ট ও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট না হয়, স্বরাজের অনুকূল ও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হইতে পারে বটে। এখন কথা উঠিয়াছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে স্বাধীনতার আশা পোষণ করা ধৃষ্টতার পরিচায়ক ও রাজদ্রোহসূচক, যাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে সন্তুষ্ট নন, তাঁহারা নিশ্চয় রাজদ্রোহী, রাষ্ট্রবিপ্লবকারী ও সর্ব্ববিধ রাজনীতিক কার্য্যে বর্জ্জনীয়। কিন্তু সেইরূপ আশা বা আদর্শের সহিত রাজদ্রোহের কোন সম্বন্ধ নাই। ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে বড় বড় ইংরাজ রাজনীতিবিদ্ বলিয়া আসিতেছেন যে, এইরূপ স্বাধীনতা ইংরাজ রাজপুরুষদেরও লক্ষ্য, এখনও ইংরাজ বিচারক-গণ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন যে স্বাধীনতা আদর্শের প্রচার ও স্বাধীনতালাভের বৈধ চেষ্টা আইনসঙ্গত ও দোষশূন্য। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্গত বা অন্তর্গত হইবে, সেই প্রশ্নের মীমাংসা জাতীয় পক্ষ কখন আবশ্যক মনে করেন না। আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ চাই। যদি বৃটিশ জাতি এমন যুক্ত সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা করে যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভারতবাসীর সেইরূপ স্বরাজ সম্ভব হয়, আপত্তি কি? আমরা ইংরাজ জাতির বিদ্বেষে স্বরাজ চেষ্টা করিতেছি না, দেশরক্ষার জন্য করিতেছি। কিন্তু আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ ভিন্ন অন্য আদর্শ স্বীকার করিয়া দেশবাসীকে মিথ্যা রাজনীতি ও দেশরক্ষার ভুল মার্গ প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত নহি।

দেশ ও জাতীয়তা

দেশ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা, জাতি নহে, ধর্ম্ম নহে, আর-কিছুই নহে, কেবল দেশ। আর-সকল জাতীয়তার উপকরণ গৌণ ও উপকারী, দেশই মুখ্য ও আবশ্যক। অনেক পরস্পরবিরোধী জাতি এক দেশে নিবাস করে, কখনও সদ্ভাব, একতা, মৈত্রী ছিল না, কিন্তু তাহাতে ভয় কি? যখন এক দেশ, এক মা— একদিন একতা হইবেই হইবে, অনেক জাতির মিলনে এক বলবান অজেয় জাতিই হইবে। ধর্ম্মমত এক নহে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে চির-বিরোধ, মিল নাই, মিলের আশাও নাই, তথাপি ভয় নাই, একদিন স্বদেশমূর্ত্তিধারিণী মায়ের প্রবল টানে ছলে বলে, সামে দণ্ডে দানে মিল হইবেই হইবে, সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা ভ্রাতৃভাবে মাতৃপ্রেমে ডুবিয়া যাইবে। এক দেশে নানা ভাষা, ভাই ভাইয়ের কথা বুঁঝিতে অক্ষম, পরস্পরের ভাবে প্রবেশ করি না, হৃদয়ে হৃদয়ে আবদ্ধ হইবার পথে অভেদ্য প্রাচীর পড়িয়া রহিয়াছে, অতিকষ্টে লঙ্ঘন করিতে হয়, তথাপি ভয় নাই; এক দেশ, এক জীবন, এক চিন্তার স্রোত সকলের মনে, প্রয়োজনের প্রেরণায় সাধারণ ভাষা সৃষ্ট হইবেই হইবে, হয় বর্ত্তমান একটি

ভাষার আধিপত্য স্বীকৃত হইবে, নহে ত নূতন ভাষার সৃষ্টি হইবে, মায়ের মন্দিরে সকলে সেই ভাষা ব্যবহার করিবে। এই সকল বাধায় চিরকাল আটকায় না, মায়ের প্রয়োজন, মায়ের টান, মায়ের প্রাণের বাসনা বিফল হয় না, তাহা সকল বাধা সকল বিরোধ অতিক্রম করে, বিনষ্ট করে, জয়ী হয়। এক মায়ের গর্ভে জন্ম হইয়াছে, এক মায়ের কোলে নিবাস করি, এক মায়ের পঞ্চভূতে মিশিয়া যাই, আন্তরিক সহস্র বিবাদ সত্ত্বেও মায়ের ডাকে মিলিত হইব। প্রাকৃতিক নিয়ম এই, সর্ব্ব দেশের ইতিহাসের শিক্ষা এই, দেশ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা, সেই সম্বন্ধ অব্যর্থ, স্বদেশ থাকিলে জাতীয়তা অবশ্যম্ভাবী। এক দেশে দুই জাতি চিরকাল থাকিতে পারে না, মিলিত হইবেই। অপর পক্ষে এক দেশ যদি না থাকে, জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা এক হউক, তাহাতে কোনও ফল নাই, একদিন স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি হইবেই। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশ সংযুক্ত করিয়া এক বৃহৎ সাম্রাজ্য করা যায়, এক বৃহৎ জাতি হয় না। সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আবার স্বতন্ত্র জাতি হয়, অনেকবার সেই অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক স্বতন্ত্রতাই সাম্রাজ্যনাশের কারণ হয়।

কিন্তু এই ফল অবশ্যম্ভাবী হইলেও মানুষের চেষ্টায়, মানুষের বুদ্ধিতে বা বুদ্ধির অভাবে সেই অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক ক্রিয়া সত্বরে বা বিলম্বে ফলবতী হয়। আমাদের দেশে কখনও একতা হয় নাই, কিন্তু চিরকাল একতার দিকে টান ছিল, স্রোত ছিল, আমাদের ইতিহাসে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গ এক করিবার জন্য

আকর্ষণ করিয়াছে। এই প্রাকৃতিক চেষ্টার কয়েকটি প্রধান অন্তরায় ছিল, প্রথম প্রাদেশিক বিভিন্নতা, দ্বিতীয় হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, তৃতীয় মাতৃদর্শনের অভাব। দেশের বৃহৎ আকার, যাতায়াতের আয়াস ও বিলম্ব, ভাষার বিভিন্নতা প্রাদেশিক অনৈক্যের মুখ্য সহায়। শেষোক্ত অন্তরায় ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সুবিধা দ্বারা আর-সকল অন্তরায় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সত্ত্বেও আকবর ভারতকে এক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ঔরংজেব নিকৃষ্ট বুদ্ধির বশ না হইলে কালের মাহাত্ম্যে, অভ্যাসের বশে, বিদেশীর আক্রমণের ভয়ে, যেমন ইংলণ্ডে কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট, তেমনই ভারতে হিন্দু ও মুসলমান চিরকালের জন্য এক হইয়া যাইত। তাঁহার বুদ্ধির দোষে, বর্ত্তমান কূটবুদ্ধি কয়েকজন ইংরাজ রাজনীতিবিদের প্ররোচনায় সেই বিরোধ প্রজ্বলিত হইয়া আর নির্ব্বাপিত হইতে চায় না। কিন্তু প্রধান অন্তরায় মাতৃদর্শনের অভাব। আমাদের রাজনীতিবিদ্‌গণ প্রায়ই মায়ের সম্পূর্ণ স্বরূপ দর্শন করিতে অসমর্থ ছিলেন। রণজিৎ সিংহ বা গুরু-গোবিন্দ ভারতমাতা না দেখিয়া পঞ্চনদমাতা দেখিয়াছিলেন। শিবাজী ও বাজীরাওঁ ভারতমাতা না দেখিয়া হিন্দুর মাতা দেখিয়াছিলেন। অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিবিদ্ মহারাষ্ট্রমাতা দেখিয়াছিলেন। আমরাও বঙ্গভঙ্গের সময়ে বঙ্গমাতা দর্শনলাভ করিয়াছিলাম—সেই দর্শন অখণ্ডদর্শন, অতএব বঙ্গদেশের ভাবী একতা ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভারতমাতার অখণ্ড

এখনও প্রকাশ হয় নাই। কংগ্রেসে যে ভারতমাতার পূজা নানারূপ স্তবস্তোত্র করিতাম, সে কল্পিত, ইংরাজের সহচরী ও প্রিয় দাসী, ম্লেচ্ছবেশভূষাসজ্জিত দানবী মায়া, সে আমাদের মা নহে, তাহার পশ্চাতে প্রকৃত মা নিবিড় অস্পষ্ট আলোকে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাদের মনপ্রাণ আকর্ষণ করিতেন। যেদিন অখণ্ডস্বরূপ মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিব, তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য উন্মত্ত হইব, সেদিন এ অন্তরায় তিরোহিত হইবে, ভারতের একতা, স্বাধীনতা ও উন্নতি সহজসাধ্য হইবে। ভাষার ভেদে আর বাধা হইবে না, সকলে স্ব স্ব মাতৃভাষা রক্ষা করিয়াও সাধারণ ভাষারূপে হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করিয়া সেই অন্তরায় বিনষ্ট করিব। হিন্দু-মুসলমান-ভেদের প্রকৃত মীমাংসা উদ্ভাবন করিতে পারিব। মাতৃ-দর্শনের অভাবে সেই অন্তরায় নাশের বলবতী ইচ্ছা নাই বলিয়া উপায় উদ্ভাবিত হয় না, বিরোধ তীব্র হইতে চলিয়াছে। কিন্তু অখণ্ডস্বরূপ চাই, যদি হিন্দুর মাতা, হিন্দু জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা বলিয়া মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, সেই পুরাতন ভ্রমে পতিত হইয়া জাতীয়তার পূর্ণ বিকাশে বঞ্চিত হইব।
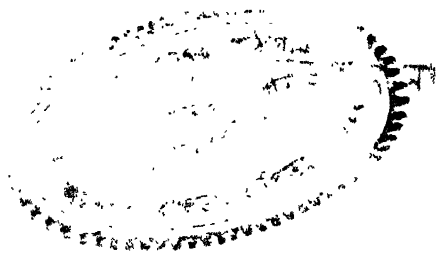
আমাদের আশা

আমাদের বাহুবল নাই, যুদ্ধের উপকরণ নাই, শিক্ষা নাই, রাজশক্তি নাই, আমাদের কিসেতে আশা, কোথায় সেই বল যাহার ভরসায় আমরা প্রবল শিক্ষিত য়ুরোপীয় জাতির অসাধ্য কাজ সাধন করিতে প্রয়াসী হই? পণ্ডিত ও বিজ্ঞব্যক্তিগণ বলেন, ইহা বালকের উদ্দাম দুরাশা, উচ্চ আদর্শের মদে উন্মত্ত অবিবেকী লোকের শূন্য স্বপ্ন, যুদ্ধই স্বাধীনতালাভের একমাত্র পন্থা, আমরা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ। স্বীকার করিলাম, আমরা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, আমরাও যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিই না। কিন্তু ইহা কি সত্যকথা যে বাহুবলই শক্তির আধার, না শক্তি আরও গূঢ়, গভীর মূল হইতে নিঃসৃত হয়? সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য যে কেবলমাত্র বাহুবলে কোন বিরাট কার্য্য সাধিত হওয়া অসম্ভব। যদি দুই পরস্পরবিরোধী সমান বলশালী শক্তির সংঘর্ষ হয়, যাহার নৈতিক ও মানসিক বল অধিক,—যাহার ঐক্য, সাহস, অধ্যবসায়, উৎসাহ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, স্বার্থত্যাগ উৎকৃষ্ট,—যাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, চতুরতা, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, দূরদর্শিতা, উপায়-উদ্ভাবনী-শক্তি বিকশিত, তাহারই জয় নিশ্চয়

হইবে। এমন কি বাহুবলে, সংখ্যায়, উপকরণে যে অপেক্ষাকৃত হীন, সে-ও নৈতিক ও মানসিক বলের উৎকর্ষে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটাইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে। তবে বলিতে পার যে, বাহুবল অপেক্ষা নৈতিক ও মানসিক বলের গুরুত্ব আছে, কিন্তু বাহুবল না থাকিলে নৈতিক বল ও মানসিক বলকে কে রক্ষা করিবে? যথার্থ কথা। কিন্তু ইহাও দেখা গিয়াছে যে দুই চিন্তাপ্রণালী, দুই সম্প্রদায়, দুই পরস্পরবিরোধী সভ্যতার সংঘর্ষে যে-পক্ষের দিকে বাহুবল, রাজশক্তি, যুদ্ধের উপকরণ প্রভৃতি উপায় পূর্ণমাত্রায় ছিল, তাহার পরাজয় হইয়াছে, যে-পক্ষের দিকে এইসকল উপায় আদবে ছিল না, তাহার জয় হইয়াছে। এই ফলের বৈপরিত্য কেন হয়? 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ', কিন্তু ধর্ম্মের পিছনে শক্তি চাই, নচেৎ অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, ধর্ম্মের গ্লানি স্থায়ী থাকিবার কথা। বিনা কারণে কার্য্য হয় না। জয়ের কারণ শক্তি। কোন্ শক্তিতে দুর্ব্বল পক্ষের জিত হয়, প্রবল পক্ষের শক্তি পরাজিত বা বিনষ্ট হয়? আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তসকল পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিব, আধ্যাত্মিক শক্তির বলে এই অঘটন ঘটিয়াছে, আধ্যাত্মিক শক্তিই বাহুবলকে তুচ্ছ করিয়া মানবজাতিকে জানায় যে এই জগৎ ভগবানের রাজ্য, অন্ধ স্থূলপ্রকৃতির লীলাক্ষেত্র নহে। শুদ্ধ আত্মা শক্তির উৎস, যে আদ্যাপ্রকৃতি গগনে অযুত সূর্য্য ঘুরাইতে থাকে, অঙ্গুলিস্পর্শে পৃথিবী দোলাইয়া মানবের সৃষ্ট পূর্ব্বগৌরবের চিহ্নসকল ধ্বংস করে, সেই আদ্যাপ্রকৃতি শুদ্ধ আত্মার

অধীন। সেই প্রকৃতি অসম্ভবকে সম্ভব করে, মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরি উল্লঙ্ঘন করিবার শক্তি দেয়। সমস্ত জগৎ সেই শক্তির সৃষ্টি। যাহার আধ্যাত্মিক বল বিকশিত তাহার জয়ের উপকরণ আপনিই সৃষ্ট হয়, বাধাবিপত্তি আপনি সরিয়া গিয়া অনুকূল অবস্থা আনায়, কার্য্য করিবার ক্ষমতা আপনিই ফুটিয়া তেজস্বিনী ও ক্ষিপ্রগতি হয়। য়ুরোপ আজকাল এই Soul-force বা আধ্যাত্মিক শক্তিকে আবিষ্কার করিতেছে, এখনও তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, তাহার ভরসায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, গৌরব, বল, মহত্ত্বের মূলে আধ্যাত্মিক শক্তি। যতবার ভারতজাতির বিনাশকাল আসন্ন বলিয়া সকলের প্রতীতি হইবার কথা ছিল, আধ্যাত্মিক বল গুপ্ত উৎস হইতে উগ্রস্রোতে প্রবাহিত হইয়া মুমূর্ষু ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে, আর সকল উপযোগী শক্তিও সৃজন করিয়াছে। এখনও সেই উৎস শুকাইয়া যায় নাই, আজও সেই অদ্ভুত মৃত্যুঞ্জয় শক্তির ক্রীড়া হইতেছে।

কিন্তু স্থূলজগতের সকল শক্তির বিকাশ সময় সাপেক্ষ, অবস্থার উপযুক্ত ক্রমে সমুদ্রের ভাটা ও জোয়ারের ন্যায় কমিয়া-বাড়িয়া শেষে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হয়। আমাদের মধ্যেও তাহাই হইতেছে। এখন সম্পূর্ণ ভাটা, জোয়ারের মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় রহিয়াছি। মহাপুরুষদের তপস্যা, স্বার্থত্যাগীর কষ্টস্বীকার, সাহসীর আত্মবিসর্জ্জন, যোগীর যোগশক্তি, জ্ঞানীর জ্ঞানসঞ্চার, সাধুর শুদ্ধতাই আধ্যাত্মিক বলের উৎস। একবার এই নানা-

বিধ পুণ্য ভারতকে সঞ্জীবনী সুধায় ভাসাইয়া মৃত জাতিকে জীবিত, বলিষ্ঠ, তেজস্বী করিয়া তুলিয়াছিল, আবার সেই তপোবল নিজের মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া অদম্য, অজেয় হইয়া বাহির হইতে উদ্যত হইয়াছে। কয়েক বৎসরের নিপীড়ন, দুর্ব্বলতা ও পরাজয়ের ফলে ভারতবাসী নিজের মধ্যে শক্তির উৎস অন্বেষণ করিতে শিখিতেছে। বক্তৃতার উত্তেজনা নহে, ম্লেচ্ছদত্ত বিদ্যা নহে, সভাসমিতির ভাবসঞ্চারিণী শক্তি নহে, সংবাদপত্রের ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা নহে, নিজের মধ্যে আত্মার বিশাল নীরবতায় ভগবান ও জীবের সংযোগে যে গভীর অবিচলিত, অভ্রান্ত শুদ্ধ সুখদুঃখজয়ী পাপপুণ্যবর্জ্জিত শক্তি সম্ভূত হয়, সেই মহাসৃষ্টিকারিণী, মহাপ্রলয়ঙ্করী, মহাস্থিতিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী মহাসরস্বতী, ঐশ্বর্য্যদায়িনী মহালক্ষ্মী, শক্তিদায়িনী মহাকালী, সেই সহস্র তেজের সংযোজনে একীভূতা চণ্ডী প্রকট হইয়া ভারতের কল্যাণে ও জগতের কল্যাণে কৃতোদ্যম হইবে। ভারতের স্বাধীনতা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের সভ্যতার শক্তিপ্রদর্শন এবং জগৎময় সেই সভ্যতার বিস্তার ও অধিকার। আমরা যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে, সভাসমিতির বলে, বক্তৃতার জোরে, বাহুবলে, স্বাধীনতা বা স্বায়ত্বশাসন আদায় করিতে পারিতাম, সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। ভারতীয় সভ্যতার বলে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে, আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্ট সূক্ষ্ম ও স্থূল উপায়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে। সেইজন্য ভগবান আমাদের পাশ্চাত্যভাবযুক্ত আন্দোলন ধ্বংস করিয়া বহির্মুখী শক্তিকে

অন্তর্মুখী করিয়াছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় দিব্যচক্ষুতে যাহা দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া বার বার বলিতেন, শক্তিকে অন্তর্মুখী কর, কিন্তু সময়ের দোষে তখন কেহ তাহা করিতে পারে নাই, স্বয়ং করিতে পারেন নাই, কিন্তু ভগবান আজ তাহা ঘটাইয়াছেন। ভারতের শক্তি অন্তর্মুখী হইয়াছে। যখন আবার বহির্মুখী হইবে, আর সেই স্রোত ফিরিবে না, কেহ রোধ করিতে পারিবে না। সেই ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা ভারত প্লাবিত করিয়া, পৃথিবী প্লাবিত করিয়া অমৃতস্পর্শে জগতের নূতন যৌবন আনয়ন করিবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

আমাদের দেশে ও য়ুরোপে মুখ্য প্রভেদ এই যে, আমাদের জীবন অন্তর্মুখী, য়ুরোপের জীবন বহির্মুখী। আমরা ভাবকে আশ্রয় করিয়া পাপপুণ্য ইত্যাদি বিচার করি, য়ুরোপ কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া পাপপুণ্য ইত্যাদি বিচার করে। আমরা ভগবানকে অন্তর্যামী ও আত্মস্থ বুঝিয়া অন্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ করি, য়ুরোপ ভগবানকে জগতের রাজা বুঝিয়া বাহিরে তাঁহাকে দেখে ও উপাসনা করে। য়ুরোপের স্বর্গ স্থূলজগতে, পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, ভোগ-বিলাস তাঁহাদের আদরণীয় ও মৃগ্য ; যদি অন্য স্বর্গ কল্পনা করেন, তাহা এই পার্থিব ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ভোগ-বিলাসের প্রতিকৃতি, তাঁহাদের ভগবান আমাদের ইন্দ্রের সমান, পার্থিব রাজার ন্যায় রত্নময় সিংহাসনে আসীন হইয়া সহস্র বন্দনা-কারী দ্বারা স্তবস্তুতিতে স্ফীত হইয়া বিশ্বসাম্রাজ্য চালান। আমাদের শিব পরমেশ্বর, অথচ ভিক্ষুক, পাগল, ভোলানাথ ; আমাদের কৃষ্ণ বালক, হাস্যপ্রিয়, রঙ্গময়, প্রেমময়, ক্রীড়া করা তাঁহার ধর্ম্ম। য়ুরোপের ভগবান্ কখন হাসেন না, ক্রীড়া করেন না, তাহাতে তাঁহার গৌরব নষ্ট হয়, তাঁহার ঈশ্বরত্ব আর

থাকে না। সেই বহির্মুখী ভাব ইহার কারণ—ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা, চিহ্ন না দেখিলে তাঁহারা জিনিষটি দেখিতে পান না, তাঁহাদের দিব্যচক্ষু নাই, সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই, সবই স্থূল। আমাদের শিব ভিক্ষুক, কিন্তু ত্রিলোকের সমস্ত ধন ও ঐশ্বর্য্য অল্পেতে সাধককে দান করেন—ভোলানাথ, কিন্তু জ্ঞানীর অপ্রাপ্য জ্ঞান তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সম্পত্তি। আমাদের প্রেমময় রঙ্গপ্রিয় শ্যামসুন্দর কুরুক্ষেত্রের নায়ক, জগতের পিতা, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সখা ও সুহৃদ। ভারতের বিরাট জ্ঞান, তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মদৃষ্টি, অপ্রতিহত দিব্যচক্ষু স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া আত্মস্থ ভাব, আসল সত্তা, অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্ব বাহির করিয়া আনে।

* *
*

পাপপুণ্য সম্বন্ধেও সেই ক্রম লক্ষিত হয়। আমরা অন্তরের ভাব দেখি। নিন্দিত কর্ম্মের মধ্যে পবিত্র ভাব, বাহ্যিক পুণ্যের মধ্যে পাপিষ্ঠের স্বার্থ লুক্কায়িত থাকিতে পারে; পাপপুণ্য, সুখদুঃখ মনের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আবরণ মাত্র। আমরা ইহা জানি; সামাজিক সুশৃঙ্খলার জন্য আমরা বাহ্যিক পাপপুণ্যকে কর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া মান্য করি, কিন্তু অন্তরের ভাবই আমাদের আদরণীয়। যে সন্ন্যাসী আচার-বিচার, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য, পাপ-পুণ্যের অতীত, জড়োন্মত্তপিশাচবৎ আচরণ করেন, সেই সর্ব্বধর্ম্ম-ত্যাগী পুরুষকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলি। পাশ্চাত্য বুদ্ধি এই তত্ত্ব-গ্রহণে অসমর্থ; যে জড়বৎ আচরণ করে, তাহাকে জড় বুঝে,

যে উন্মত্তবৎ আচরণ করে, তাহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বুঝে, যে পিশাচবৎ আচরণ করে, তাহাকে ঘৃণ্য অনাচারী পিশাচ বুঝে ; কেননা সূক্ষ্মদৃষ্টি নাই, তাঁহারা অন্তরের ভাব দেখিতে অসমর্থ।

* *
*

সেইরূপ বাহ্যদৃষ্টিপরবশ হইয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, ভারতে প্রজাতন্ত্র কোনও যুগে ছিল না। প্রজাতন্ত্রসূচক কোনও কথা সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না, আধুনিক পার্লিয়ামেণ্টের ন্যায় কোন আইন-ব্যবস্থাপক সভাও ছিল না, প্রজাতন্ত্রের বাহ্য-চিহ্নের অভাবে প্রজাতন্ত্রের অভাব প্রতিপন্ন হয়। আমরাও এই পাশ্চাত্য যুক্তি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। আমাদের প্রাচীন আর্য্যরাজ্যে প্রজাতন্ত্রের অভাব ছিল না ; প্রজাতন্ত্রের বাহ্যিক উপকরণ অসম্পূর্ণ ছিল বটে, কিন্তু প্রজাতন্ত্রের ভাব আমাদের সমস্ত সমাজ ও শাসনতন্ত্রেরঅন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া প্রজার সুখ ও দেশের উন্নতি রক্ষা করিত। প্রথমতঃ, প্রত্যেক গ্রামে সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র ছিল, গ্রামের লোক সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের পরামর্শে বৃদ্ধ ও নেতৃস্থানীয় পুরুষদের অধীনে গ্রামের ব্যবস্থা, সমাজের ব্যবস্থা, করিতেন ; এই গ্রাম্য প্রজাতন্ত্র মুসলমানদের আমলে অক্ষুন্ন রহিল, বৃটিশ শাসনতন্ত্রের নিষ্পেষণে সেইদিন নষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যেও, যেখানে সর্ব্ব-সাধারণকে সম্মিলিত করিবার সুবিধা ছিল, সেইরূপ প্রথা বিদ্যমান ছিল, বৌদ্ধ সাহিত্যে, গ্রীক ইতিহাসে, মহাভারতে ইহার যথেষ্ট

প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, বড় বড় রাজ্যে, যেখানে এইরূপ বাহ্যিক উপকরণ থাকা অসম্ভব, প্রজাতন্ত্রের ভাব রাজতন্ত্রকে পরিচালিত করিত। প্রজার আইনব্যবস্থাপক সভা ছিল না, কিন্তু রাজারও আইন করিবার বা প্রবর্ত্তিত আইন পরিবর্ত্তন করিবার লেশমাত্র অধিকার ছিল না। প্রজারা যে আচারব্যবহার রীতিনীতি আইনকানুন মানিয়া আসিতেছিল, তাহার রক্ষাকর্ত্তা রাজা। ব্রাহ্মণগণ আধুনিক উকিল ও জজদের ন্যায় সেই প্রজা-অনুষ্ঠিত নিয়মসকল রাজাকে বুঝাইতেন, সংশয়স্থলে নির্ণয় করিতেন, ক্রমে ক্রমে যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেন, তাহা লিখিত-শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিতেন। শাসনের ভার রাজারই ছিল, কিন্তু সেই ক্ষমতাও আইনের কঠিন নিগড়ে নিবদ্ধ; তাহা ভিন্ন রাজা প্রজার অনুমোদিত কার্য্যই করিবেন, প্রজার অসন্তোষ যাহাতে হয়, তাহা কখন করিবেন না, এই রাজনীতিক নিয়ম সকলেই মানিয়া চলিত। রাজা তাহার ব্যতিক্রম করিলে, প্রজারা আর রাজাকে মান্য করিতে বাধ্য ছিল না।

* *
*

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণ এই যুগের ধর্ম্ম। কিন্তু এই একীকরণে পাশ্চাত্যকে প্রতিষ্ঠা বা মুখ্য অঙ্গ যদি করি, আমরা বিষম ভ্রমে পতিত হইব। প্রাচ্যই প্রতিষ্ঠা, প্রাচ্যই মুখ্য অঙ্গ। বহির্জ্জগত অন্তর্জ্জগতে প্রতিষ্ঠিত, অন্তর্জ্জগত বহির্জ্জগতে প্রতিষ্ঠিত নহে। ভাব ও শ্রদ্ধা শক্তি ও কর্ম্মের উৎস, ভাব

ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু শক্তিপ্রয়োগে ও কর্ম্মের বাহ্যিক আকারে ও উপকরণে আসক্ত হইতে নাই। পাশ্চাত্যেরা প্রজাতন্ত্রের বাহ্যিক আকার ও উপকরণ লইয়া ব্যস্ত। ভাবকে পরিস্ফুট করিবার জন্য বাহ্যিক আকার ও উপকরণ; ভাব আকারকে গঠন করে, শ্রদ্ধা উপকরণ সৃজন করে। কিন্তু পাশ্চাত্যেরা আকারে ও উপকরণে এমন আসক্ত যে, সেই বহিঃপ্রকাশের মধ্যে ভাব ও শ্রদ্ধা মরিয়া যাইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন না। আজকাল প্রাচ্য দেশে প্রজাতন্ত্রের ভাব ও শ্রদ্ধা প্রবলবেগে পরিস্ফুট হইয়া বাহ্য উপকরণ সৃজন করিতেছে, বাহ্য আকার গঠন করিতেছে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে সেই ভাব ম্লান হইতেছে, সেই শ্রদ্ধা ক্ষীণ হইতেছে। প্রাচ্য প্রভাতোন্মুখ, আলোকের দিকে ধাবিত—পাশ্চাত্য তিমিরগামী রাত্রির দিকে ফিরিয়া যাইতেছে।

* *
*

ইহার কারণ, সেই বাহ্য আকার ও উপকরণে আসক্তির ফলে প্রজাতন্ত্রের দুষ্পরিণাম। প্রজাতন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুকূল শাসনতন্ত্র সৃজন করিয়া আমেরিকা এতদিন গর্ব্ব করিতেছিল যে আমেরিকার তুল্য স্বাধীন দেশ জগতে আর নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রেসিডেণ্ট ও কর্ম্মচারিগণ কংগ্রেসের সাহায্যে স্বেচ্ছায় শাসন করেন, ধনীর অন্যায়, অবিচার ও সর্ব্বগ্রাসী

লোভকে আশ্রয় দেন, নিজেরাও ক্ষমতার অপব্যবহারে ধনী হন। একমাত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সময়ে প্রজারা স্বাধীন, তখনও ধনীরা প্রচুর অর্থব্যয়ে নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখেন, পরেও প্রজার প্রতিনিধিগণকে কিনিয়া স্বেচ্ছায় অর্থশোষণ করেন, আধিপত্য করেন। ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্মভূমি, কিন্তু যে কর্ম্মচারীবর্গ ও পুলিস প্রজার ইচ্ছায় প্রত্যেক শাসনকার্য্য চালাইবার যন্ত্রস্বরূপ বলিয়া সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা এখন বহু-সংখ্যক ক্ষুদ্র স্বেচ্ছাচারী রাজা হইয়া বসিয়াছে, প্রজারা তাহাদের ভয়ে কাতর। ইংলণ্ডে এইরূপ বিভ্রাট ঘটে নাই বটে, কিন্তু প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য বিপদ পরিস্ফুট হইতেছে। চঞ্চলমতি অর্দ্ধ-শিক্ষিত প্রজার প্রত্যেক মতপরিবর্ত্তনে শাসনকার্য্য ও রাজনীতি আলোড়িত হয় বলিয়া বৃটিশজাতি পুরাতন রাজনীতিক কুশলতা হারাইয়া বাহিরে-অন্তরে বিপদগ্রস্ত হইতেছে। শাসনকর্ত্তৃগণ কর্ত্তব্যজ্ঞানরহিত, নিজ স্বার্থ ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার জন্য নির্ব্বাচকবর্গকে প্রলোভন দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া, ভুল বুঝাইয়া বৃটিশজাতির বুদ্ধি বিকৃত করিতেছেন, মতির অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যবর্দ্ধন করিতেছেন। এই সকল কারণ বশতঃ একদিকে প্রজাতন্ত্রবাদ ভ্রান্ত বলিয়া একদল স্বাধীনতার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছে, অপরদিকে এনার্কিষ্ট, সোশালিষ্ট, বিপ্লবকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এই দুই পক্ষের সংঘর্ষ ইংলণ্ডে চলিতেছে—রাজনীতিক্ষেত্রে; আমেরিকায়—শ্রমজীবী ও লক্ষ-পতির বিরোধে; জর্ম্মণীতে মত সংগঠনে; ফ্রান্সে—সৈন্যে ও

নৌসৈন্যে, রুশে—পুলিস ও হত্যাকারীর সংগ্রামে—সর্ব্বত্র গণ্ডগোল, চঞ্চলতা, অশান্তি।

বহির্ম্মুখী দৃষ্টির এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। কয়েকদিন রাজসিক তেজে তেজস্বী হইয়া অসুর মহান্ শ্রীসম্পন্ন, অজেয় হয়, তাহার পরে অন্তর্নিহিত দোষ বাহির হয়, সব ভাঙ্গিয়া চূরমার হয়। ভাব ও শ্রদ্ধা, সজ্ঞান কর্ম্ম, অনাসক্ত কর্ম্ম যে দেশে শিক্ষার মূলমন্ত্র, সেই দেশেই অন্তর ও বাহির, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির সকল সমস্যার সন্তোষ-জনক মীমাংসা কার্য্যতঃ হইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান ও শিক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সেই মীমাংসা করিতে পারিব না। প্রাচ্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পাশ্চাত্যকে আয়ত্ত করিতে হইবে। অন্তরে প্রতিষ্ঠা, বাহিরে প্রকাশ। ভাবের পাশ্চাত্য উপকরণ অবলম্বন করিলে বিপদগ্রস্ত, হইব, নিজ স্বভাব ও প্রাচ্যবুদ্ধির উপযুক্ত সৃজন করিতে হইবে।

ভ্রাতৃত্ব

আধুনিক সভ্যতার যে তিন আদর্শ বা চরম উদ্দেশ্য ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল, আমাদের ভাষায় সাধারণতঃ এই তিন তত্ত্ব—স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু পাশ্চাত্য ভাষায় যাহাকে fraternity বলে, তাহা মৈত্রী নহে। মৈত্রী মনের ভাব; যে সর্ব্বভূতের কল্যাণ ইচ্ছা করে, কাহারও অনিষ্ট করে না, সেই দয়াবান্, অহিংসাপরায়ণ সর্ব্বভূতহিতরত পুরুষকে "মিত্র" বলে, মৈত্রী তাহার মনের ভাব। এইরূপ ভাব ব্যক্তির মানসিক সম্পত্তি,—ব্যক্তির জীবন ও কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে; এই ভাব রাজনীতিক বা সামাজিক শৃঙ্খলার মুখ্য বন্ধন হওয়া অসম্ভব। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের তিন তত্ত্ব ব্যক্তিগত জীবনের নৈতিক নিয়ম নহে, সমাজ ও দেশের ব্যবস্থার নবগঠনোপযোগী সূত্রত্রয়, সমাজের, দেশের বাহ্য অবস্থিতিতে প্রকাশোন্মুখ প্রাকৃতিক মূলতত্ত্ব। fraternityর অর্থ ভ্রাতৃত্ব।

ফরাসী বিপ্লবকারিগণ রাজনীতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ও সাম্য লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন, ভ্রাতৃত্বের উপর তাঁহাদের

দৃঢ় লক্ষ্য ছিল না, ভ্রাতৃত্বের অভাব ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের অসম্পূর্ণতার কারণ। সেই অপূর্ব্ব উত্থানে রাজনীতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা য়ুরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজনীতিক সাম্যও কতক পরিমাণে কয়েক দেশে শাসনতন্ত্র ও আইনপদ্ধতিকে অধিকার করে। কিন্তু ভ্রাতৃত্বের অভাবে সামাজিক সাম্য অসম্ভব, ভ্রাতৃত্বের অভাবে য়ুরোপ সামাজিক সাম্যে বঞ্চিত হয়। এই তিন মূলতত্ত্বের পূর্ণবিকাশ পরস্পরের বিকাশের উপর নির্ভর করে ; সাম্য স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, সাম্যের অবর্ত্তমানে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভ্রাতৃত্ব সাম্যের প্রতিষ্ঠা, ভ্রাতৃত্বের অবর্ত্তমানে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভ্রাতৃভাব থাকিলে ভ্রাতৃত্ব। য়ুরোপে ভ্রাতৃভাব নাই, য়ুরোপে সাম্য ও স্বাধীনতা কলুষিত, অপ্রতিষ্ঠিত, অসম্পূর্ণ—এইজন্য য়ুরোপে গণ্ডগোল ও বিপ্লব নিত্য অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; এই গণ্ডগোল ও বিপ্লবকে য়ুরোপ সগর্ব্বে progress বা উন্নতি বলে।

য়ুরোপের যেটুকু ভ্রাতৃভাব, তাহা দেশ লইয়া—একদেশের লোক, হিতাহিত এক, একতায় জাতীয় স্বাধীনতা নিরাপদ থাকে—এই জ্ঞান য়ুরোপের একত্বের হেতু। তাহার বিরুদ্ধে আর-একটি জ্ঞান দণ্ডায়মান হইয়াছে, সে 'এই—আমরা সকলে মানুষ, মানুষ সকলে এক হওয়া উচিত, মানুষে মানুষে ভেদ অজ্ঞানপ্রসূত, অনিষ্টকর ; জাতীয়তা ভেদের কারণ, জাতীয়তা অজ্ঞানপ্রসূত, অনিষ্টকারক, অতএব জাতীয়তাকে বর্জ্জন করিয়া মনুষ্যজাতির একত্ব প্রতিষ্ঠিত করি। বিশেষতঃ যে ফ্রান্সে

স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বরূপ মহান আদর্শ প্রথম প্রচারিত হয়, সেই ভাবপ্রবণ দেশে এই দুই পরস্পরবিরোধী জ্ঞানের সংঘর্ষ চলিতেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এই দুই জ্ঞান ও ভাব পরস্পর-বিরোধী নহে। জাতীয়তাও সত্য, মানবজাতির একতাও সত্য, দুই সত্যের সামঞ্জস্যেই মানবজাতির কল্যাণ; যদি আমাদের বুদ্ধি এই সামঞ্জস্যে অসমর্থ হয়, অবিরোধী তত্ত্বের বিরোধে আসক্ত হয়, সেই বুদ্ধিকে ভ্রান্ত রাজসিক বুদ্ধি বলিতে হয়।

সাম্যশূন্য রাজনীতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার উপর বিতৃষ্ণ হইয়া য়ূরোপ এখন সোশিয়ালিজমের দিকে ধাবিত হইয়াছে। দুই দল হইয়াছে, এনার্কিষ্ট ও সোশালিষ্ট। এনার্কিষ্ট বলে,—এই রাজনীতিক স্বাধীনতা মায়া, গভর্ণমেণ্ট বলিয়া বড় লোকের অত্যাচারের যন্ত্র স্থাপন করিয়া রাজনীতিক স্বাধীনতা রক্ষার অজুহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দলন করা এই মায়ার লক্ষণ, অতএব সর্ব্বপ্রকার গভর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দাও, প্রকৃত স্বাধীনতা স্থাপন কর। গভর্ণমেণ্টের অবর্ত্তমানে কে স্বাধীনতা ও সাম্য রক্ষা করিবে, বলবানের অত্যাচার নিবারণ করিবে, এই আপত্তির উত্তরে এনার্কিষ্ট বলে, শিক্ষাবিস্তারে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও ভ্রাতৃভাব বিস্তার কর, জ্ঞান ও ভ্রাতৃভাব স্বাধীনতা ও সাম্য রক্ষা করিবে, যদি কেহ ভ্রাতৃভাব উল্লঙ্ঘন করিয়া অত্যাচার করে, তাহাকে যে-সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারে। সোশালিষ্ট এই কথা বলে না; সে বলে, গভর্ণমেণ্ট থাকুক, গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজন আছে,

কিন্তু সমাজ ও শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠা করি, এখন যে সমাজের ও শাসনতন্ত্রের দোষ আছে, সেই সকল সংশোধিত হইবে, মানবজাতি সম্পূর্ণ সুখী, স্বাধীন, ভ্রাতৃভাবাপন্ন হইবে। সেইজন্য সোশালিষ্ট সমাজকে এক করিতে চায়; ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিয়া সমাজের সম্পত্তি যদি থাকে—যেমন একান্নবর্ত্তী পরিবারের সম্পত্তি, কোন ব্যক্তির নহে, পরিবারের, পরিবারই দেহ, ব্যক্তি সে দেহের অঙ্গ—তাহা হইলে সমাজে ভেদ থাকিবে না, সমাজ এক হইবে।

এনার্কিষ্টের ভুল, ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট বিনাশের চেষ্টা। সম্পূর্ণ ভ্রাতৃভাব হইবার অনেক বিলম্ব আছে, ইতিমধ্যে শাসনতন্ত্র উঠানর নিশ্চিত ফল ঘোর অরাজকতায় পশুভাবের আধিপত্য। রাজা সমাজের কেন্দ্র, শাসনতন্ত্র স্থাপনে মনুষ্য পশুভাব এড়াইতে সক্ষম। যখন সম্পূর্ণ ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইবে. তখন ভগবান, কোনও পার্থিব প্রতিনিধি নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং পৃথিবীতে রাজা করিয়া সকলের হৃদয়ে সিংহাসন পাতিয়া বসিবেন, খৃষ্টানদের Reign of the Saints সাধুদের রাজা, আমাদের সত্যযুগ স্থাপিত হইবে। মনুষ্যজাতি এত উন্নতি লাভ করে নাই যে এই অবস্থা শীঘ্র হইতে পারে, কেবল এই অবস্থার আংশিক উপলব্ধি সম্ভব।

সোশালিষ্টের ভুল ভ্রাতৃত্বের উপর সাম্য প্রতিষ্ঠিত না করিয়া সাম্যের উপর ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। সাম্যহীন ভ্রাতৃত্ব সম্ভব, ভ্রাতৃত্বহীন সাম্য টিকিতে পারে না, মতভেদে, কলহে, আধি-

পত্যের উদ্দাম লালসায় বিনষ্ট হইবে। প্রথম সম্পূর্ণ ভ্রাতৃত্ব, পরে সম্পূর্ণ সাম্য।

ভ্রাতৃত্ব বাহিরের অবস্থা—ভ্রাতৃভাবে যদি থাকি, সকলের এক সম্পত্তি, এক হিত, এক চেষ্টা যদি থাকে, তাহাকেই ভ্রাতৃত্ব বলে। বাহিরের অবস্থা অন্তরের ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ভ্রাতৃপ্রেমে ভ্রাতৃত্ব সজীব ও সত্য হয়। সেই ভ্রাতৃপ্রেমেরও প্রতিষ্ঠা চাই। অমরা এক মায়ের সন্তান, দেশভাই, এই ভাব একরূপ ভ্রাতৃ-প্রেমের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সেই ভাব রাজনীতিক একতার বন্ধন হয়, তাহাতে সামাজিক একতা হয় না। আরও গভীর স্থানে প্রবেশ করিতে হয়, যেমন নিজের মাকে অতিক্রম করিয়া সকলে দেশ-ভাইয়ের মাকে উপাসনা করি, সেইরূপ দেশকে অতিক্রম করিয়া জগজ্জননীকে উপলব্ধি করিতে হয়। খণ্ড শক্তিকে অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছিতে হয়। কিন্তু যেমন ভারত-জননীর উপাসনায় শরীরের জননীকে অতিক্রম করিয়াও বিস্মৃত হই না, তেমনই জগজ্জননীর উপাসনায় ভারতজননীকে অতিক্রম করিয়াও বিস্মৃত হইব না। তিনিও কালী, তিনিও মা।

ধর্ম্মই ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা। সকল ধর্ম্ম এই কথা বলে যে, আমরা এক, ভেদ অজ্ঞান প্রসূত, দ্বেষপ্রসূত, প্রেম সকল ধর্ম্মের মূল শিক্ষা। আমাদের ধর্ম্মও বলে, অমরা সকলে এক, ভেদবুদ্ধি অজ্ঞানের লক্ষণ, জ্ঞানী সকলকে সমান চক্ষে দেখিবেন, সকলের মধ্যে এক আত্মা, সমভাবে প্রতিষ্ঠিত এক নারায়ণ দর্শন করিবেন। এই ভক্তিপূর্ণ সমতা হইতে বিশ্বপ্রেমের উৎপত্তি হয়। কিন্তু

এই জ্ঞান মানবজাতির পরম গন্তব্যস্থান আমাদের শেষ অবস্থায় সর্ব্বব্যাপী হইবে, ইতিমধ্যে তাহার আংশিক উপলব্ধি করিতে হয়, অন্তরে, বাহিরে, পরিবারে, সমাজে, দেশে, সর্ব্বভূতে। মানবজাতি পরিবার, কুল, দেশ, সম্প্রদায় প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া শাস্ত্র বা নিয়মের বন্ধনে দৃঢ় করিয়া এই ভ্রাতৃত্বের স্থায়ী আধার গঠন করিতে চিরকাল প্রয়াসী। এই পর্য্যন্ত সেই চেষ্টা বিফল হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা আছে, আধার আছে, কিন্তু ভ্রাতৃত্বের প্রাণরক্ষক অক্ষয় কোন শক্তি চাই, যাহাতে সেই প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ, সেই আধার চিরস্থায়ী বা নিত্য নূতন হইয়া থাকে। ভগবান এখনও সেই শক্তি প্রকাশ করেন নাই। তিনি রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানবের কঠোর স্বার্থপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমের উপযুক্ত পাত্র হইবার জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। কবে সেইদিন আসিবে যখন তিনি আবার অবতীর্ণ হইয়া চিরপ্রেমানন্দ মানবহৃদয়ে সঞ্চারিত ও স্থাপিত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করিবেন?

ভারতীয় চিত্রবিদ্যা

আমাদের এই ভারতজননী যে জ্ঞানের, ধর্ম্মের, সাহিত্যের শিল্পের অক্ষয় আকর ছিল, তাহা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সকল জাতিই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে য়ূরোপের এই ধারণা ছিল যে আমাদের যেমন উচ্চদরের সাহিত্য ও শিল্প ছিল, ভারতীয় চিত্রবিদ্যা তেমন উৎকৃষ্ট ছিল না, বরং সে জঘন্য সৌন্দর্য্যহীন ছিল। আমরাও পাশ্চাত্য জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া চোখে য়ুরোপীয় চশমা পরিয়া ভারতীয়চিত্র ও স্থাপত্য দর্শনে নাক সিট্‌কাইয়া নিজ মার্জ্জিত বুদ্ধি ও নির্দ্দোষ রুচির পরিচয় দিতাম। আমাদের ধনীদের গৃহ গ্রীক প্রতিমা ও ইংরাজী ছবির castএ বা নির্জ্জীব অনুকরণে ভরিয়া গেল, সাধারণ লোকের বাড়ীর দেওয়াল জঘন্য তৈলচিত্রে শোভিত হইতে লাগিল। যে ভারত-জাতির রুচি ও শিল্পচাতুর্য্য জগতে অপ্রতিম ছিল, বর্ণ ও রূপ গ্রহণে যে ভারতজাতির রুচি স্বভাবতঃ নির্ভুল ছিল, সেই জাতির চোখ অন্ধ, বুদ্ধি ভাবগ্রহণে অক্ষম, রুচি ইতালীয় কুলী-মজুরের রুচি হইতে অধম হইল। রাজা রবিবর্ম্মা ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারিলেন। সম্প্রতি কয়েকজন রসজ্ঞ

ব্যক্তির উদ্যমে ভারতবাসীর চোখ খুলিতেছে, নিজের ক্ষমতা, নিজের ঐশ্বর্য্য বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ প্রতিভার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকজন যুবক লুপ্ত ভারতীয় চিত্রবিদ্যার পুনরুদ্ধার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিভার গুণে বঙ্গদেশে নূতন যুগের সূচনা হইতেছে। ইহার পরে আশা করা যায় যে ভারত ইংরাজের চোখে না দেখিয়া নিজ চোখে দেখিবে, পাশ্চাত্যের অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাঞ্জল বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া আবার চিত্রিত রূপ ও বর্ণে ভারতের সনাতন ভাব ব্যক্ত করিবে।

ভারতীয় চিত্রবিদ্যার উপর পাশ্চাত্যের বিতৃষ্ণার দুই কারণ আছে। তাঁহারা বলেন, ভারতীয় চিত্রকরগণ natureএর অনুকরণ করিতে অক্ষম, ঠিক মানুষের মত মানুষ, ঘোড়ার মত ঘোড়া, গাছের মত গাছ না আঁকিয়া বিকৃত মূর্ত্তি করেন, তাঁহাদের perspective নাই, ছবিগুলি চ্যাপ্টা ও অস্বাভাবিক বোধ হয়। দ্বিতীয় আপত্তি, এই সকল ছবিতে সুন্দর ভাব ও সুন্দর রূপের নিতান্ত অভাব। শেষোক্ত আপত্তি আর য়ুরোপীয় মুখে শুনা যায় না। আমাদের পুরাতন বুদ্ধমূর্ত্তির অতুলনীয় শান্ত-ভাব, আমাদের পুরাতন দুর্গামূর্ত্তিতে অপার্থিব শক্তির প্রকাশ দেখিয়া য়ুরোপীয়গণ প্রীত ও স্তম্ভিত হন। যাঁহারা বিলাতে শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিয়া বিখ্যাত তাহারা স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতীয় চিত্রকর য়ুরোপের perspective না জানুন, ভারতের যে perspectiveএর নিয়ম তাহা অতি সুন্দর, সম্পূর্ণ ও সঙ্গত

ভারতীয় চিত্রকর ও অন্যান্য শিল্পী যে ঠিক বাহ্য জগতের অনুকরণ করেন না, ইহা সত্য। কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে নহে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য বাহ্য দৃশ্য ও আকৃতি অতিক্রম করিয়া অন্তঃস্থ ভাব ও সত্য প্রকাশ করা। বাহ্য আকৃতি এই আন্তরিক সত্যের আবরণ, ছদ্মবেশ—সেই ছদ্মবেশের সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া আমরা যাহা ভিতরে লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব ভারতীয় চিত্রকরগণ ইচ্ছা করিয়া বাহ্য আকৃতি বদলাইয়া আন্তরিক সত্য প্রকাশ করিবার উপযোগী করিলেন। তাঁহারা কি সুন্দরভাবে প্রত্যেক অঙ্গে এবং চতুর্দ্দিকের দৃশ্যে, আসনে, বেশে, মানসিক ভাব বা ঘটনার অন্তর্গত সত্য প্রকাশ করেন, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাই ভারতীয় চিত্রের প্রধান গুণ, চরম উৎকর্ষ।

পাশ্চাত্য বাহিরের মিথ্যা অনুভব লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা ছায়ার ভক্ত; প্রাচ্য ভিতরের সত্য অনুসন্ধান করে, আমরা নিত্যের ভক্ত। পাশ্চাত্য শরীরের উপাসক, আমরা আত্মার উপাসক। পাশ্চাত্য নাম-রূপে অনুরক্ত, আমরা নিত্যবস্তু না পাইয়া কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। এই প্রভেদ যেমন ধর্ম্মে, দর্শনে, সাহিত্যে—তেমনই চিত্রবিদ্যায় ও স্থাপত্যবিদ্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়।